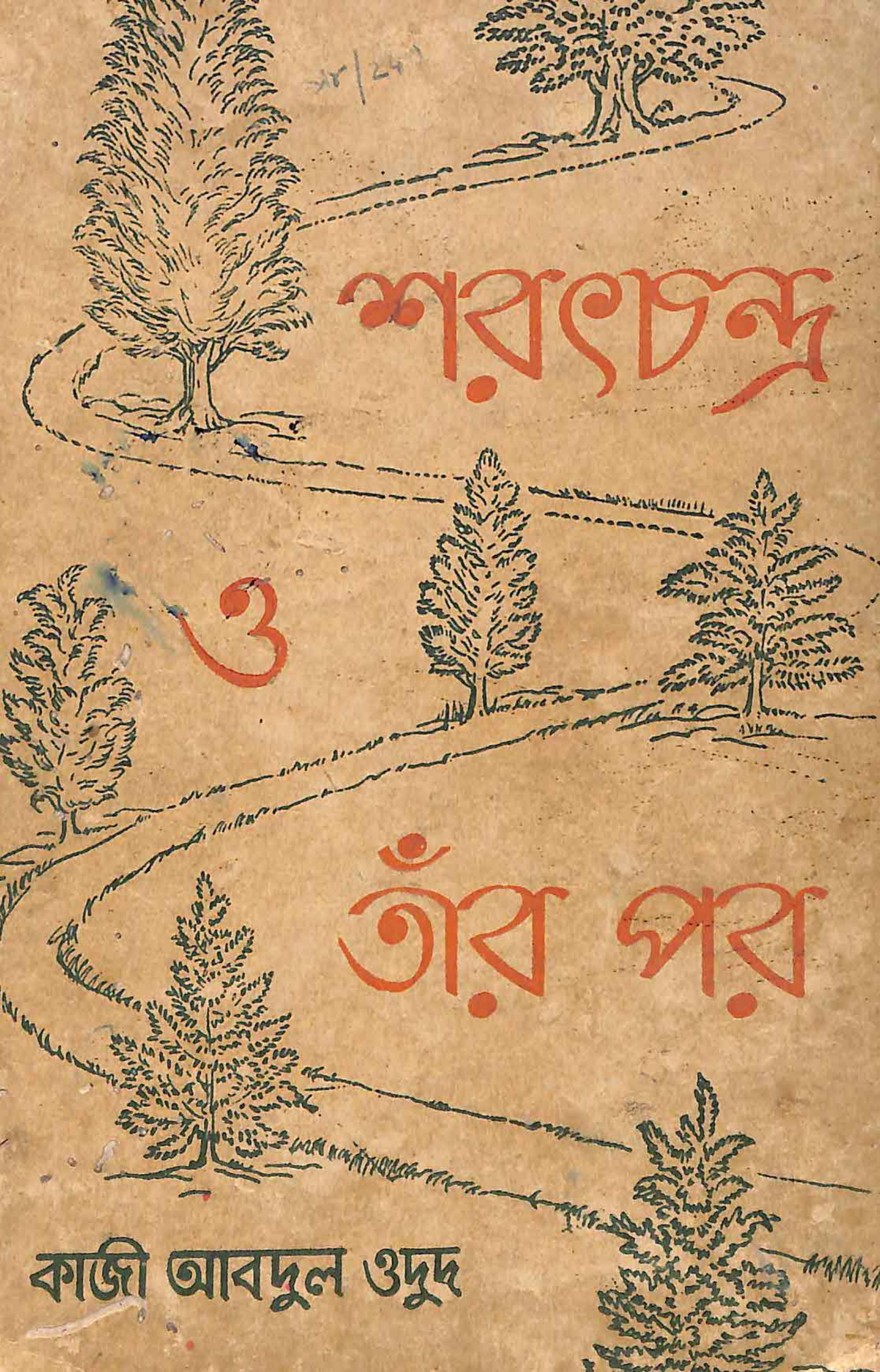


শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর

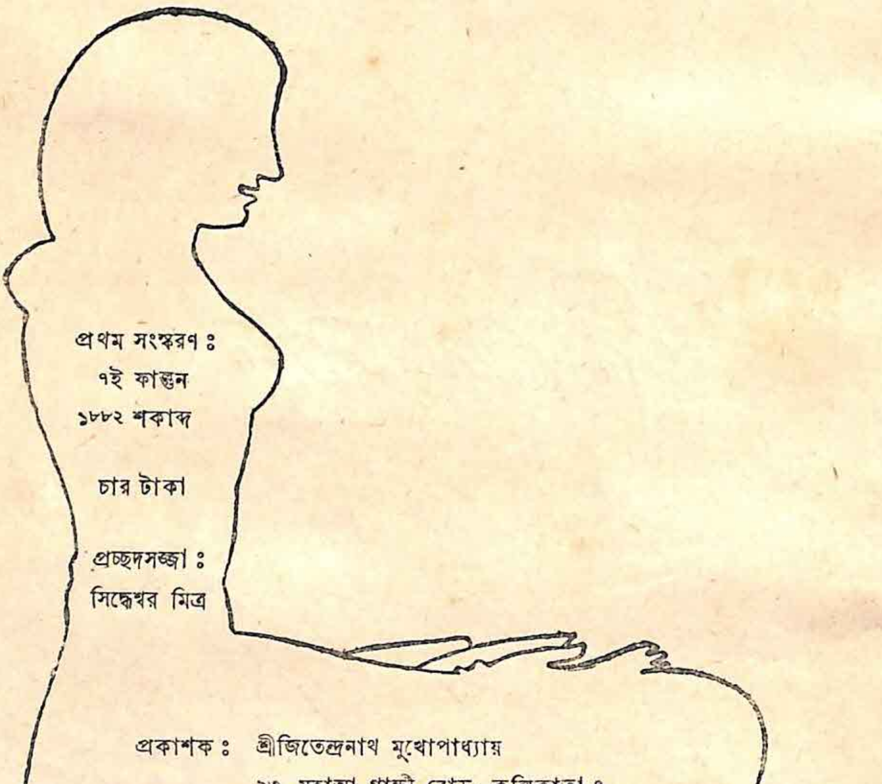
কাজী আবদুল ওদুদ

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর

[১৯৫৭ সালে ডিসেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতামালা]

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ফাল্গুন
১৮৮২ শকাব্দ

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
সিদ্ধেশ্বর মিত্র

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীপঞ্চানন পাল
লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৫।১, ঈশ্বর মিল লেন কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শরৎচন্দ্রের রচনা
যাঁর বিশেষ সমাদরের বস্তু ছিল
সেই আমার পরলোকগতা সহধর্মিণীর
স্মৃতির উদ্দেশে



মুখবন্ধ

১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতীতে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই সময়ে আমন্ত্রিত হই ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্যে। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দিই 'বাংলার জাগরণ' সম্পর্কে আর ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎ-স্মৃতি' বক্তৃতা দিই 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' এই বিষয়ে। আমার ইচ্ছা ছিল এই শেষোক্ত বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা দেব; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মহোদয় চারটি বক্তৃতা দেওয়া ভাল মনে করেন; তাঁর কথা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করে' চারটি বক্তৃতাই আমি দিই—প্রথম তিনটি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ও চতুর্থটি তাঁর পরবর্তীদের সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য তাতে শরৎ-পরবর্তীদের, অর্থাৎ আমাদের আধুনিক গল্প-উপন্যাস-লিখিয়েদের, সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য নিবেদন করতে হয়েছিল, আর সেই বক্তৃতার সময়েই জানিয়েছিলাম, পরে এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার রইল।

'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' বইটিতে সেই সংক্ষিপ্ত চতুর্থ আলোচনাটি পুনর্লিখিত হয়েছে। এবারেও অনেকের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করিনি—কেন, সে কথা লেখাটির মধ্যেই বলা হয়েছে—তবে আধুনিকদের সম্বন্ধে আমার নিবেদন খুব অপূর্ণাঙ্গ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করেছি।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি উপদেশ দিয়েছেন সমসাময়িক লেখকদের সম্বন্ধে কিছু না বলতে। তাঁদের উপদেশের অর্থ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাঁদের সেই উপদেশ অনুসারে চলা—হয়ত চলা যায় না। জীবনের খুব বড় অংশ হচ্ছে সমসাময়িক জীবন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 'সনাতন' 'চিরন্তন' এ সবের দাবি যত বড় 'সমসাময়িকে'র দাবি তার চাইতে কম নয়—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তো যে সমসাময়িকের মধ্যে চিরন্তনকে না বুঝেছে সে কিছুই বোঝেনি। অর্থাৎ, জীবনকে যে চায়, সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার উপায় তার জন্য নেই। তবে জীবনের সব ক্ষেত্রে সংঘর্ষের এক চেহারা নয়।

সমালোচক-শিরোমণি প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে সংঘর্ষকে তুলনা করেছেন লাঠি-খেলার সঙ্গে। খেলোয়াড়েরা পরস্পরের গায়ে যতটা আঘাত

দেয় তা ফাঁক দেখিয়ে দেবার জন্য—তার অতিরিক্ত আঘাত দেয় আনাড়ীরা। আমার আলোচনায় যদি কোথাও অতিরিক্ত আঘাত দিয়ে থাকি তবে সে আমার অক্ষমতারই জন্য। সহৃদয়রা তা ক্ষমা করে' নেবেন।

এই সুযোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের দ্বারা আমন্ত্রিত না হলে এই আলোচনাটিতে হাত দিতাম কিনা বলা কঠিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে বক্তৃতাগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশের ভার নিয়েছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলিকাতা,
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

কাজী আবদুল ওদুদ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	আলালের ঘরে	আলালের ঘরের
২৫	৮	চিন্তাকর্ষক	চিত্তাকর্ষক
৪০	৭	উঠেন নি	ওঠেন নি
৫৮	১০	প্রেমেই	প্রেমই
৬২	১৬	ঘুমিয়েছিল	ঘুমিয়ে ছিল
৬৩	৩	না,	না।
৬৪	১৪	‘শেষ প্রশ্ন’	‘শেষ প্রশ্নে’
১৩৭	২০	সাহিত্যে বাস্তব	সাহিত্যে বাস্তব

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর

একালে উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলা সাহিত্যে তার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে, এবিষয়ে আমাদের সাহিত্যিকরা মোটের উপর একমত। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেও কোনো কোনো কাহিনী-জাতীয় রচনায়—বিশেষ করে "আলালের ঘরের দুলালে"—চরিত্র-সৃষ্টির উদ্যম চোখে পড়ে। তবু সে-সব পুরোপুরি উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, কেননা, জীবনের চিত্র কিছু কিছু থাকলেও সে-সব প্রধানত উদ্দেশ্য-মূলক। 'প্রধানত উদ্দেশ্যমূলক' এই কথাটির দিকে আমরা বন্ধু-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভাল উপন্যাসেও উদ্দেশ্য যে কখনো কখনো স্পষ্ট হয়ে না ওঠে তা নয়; তবু জীবনের চিত্রই—জীবনের বিচিত্র আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ চিত্র—তাতে চোখে পড়ে বেশি। এর বহু দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশের সুপরিচিত সাহিত্যগুলো থেকে দেওয়া যেতে পারে। আমরা যে আলোচনা আরম্ভ করেছি তাতেও এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

উপন্যাসে চাই জীবনের ব্যাপক আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ চিত্র—এই বিষয়টি অনুধাবন করলে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরের উপন্যাস, বিশেষ করে' বঙ্কিমচন্দ্রের আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, এই দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে যাঁরা মন্তব্য করেছেন: বঙ্কিমচন্দ্র নীতি-উপদেশের দিকে প্রবণতা বেশি দেখিয়েছেন, বাস্তবতা-বোধের পরিচয় তিনি যা দিয়েছেন তাঁর পরবর্তী প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্র, বিশেষ করে শরৎচন্দ্র, তার চাইতে বেশি দিয়েছেন—এসব কথা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—বঙ্কিম-চন্দ্রের "বিষবৃক্ষ"। নাম থেকেই অনুমান হয় সংসারে বিষবৃক্ষ কি সেটি লেখকের নির্দেশের বিষয়। গ্রন্থের শেষে তিনি বলেছেন:

"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম, ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" নীতি-উপদেশের দিকে লেখকের পক্ষপাত যে স্পষ্ট তা নিঃসন্দেহ। তবু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, রচনা হিসাবে "বিষবৃক্ষে"র মর্যাদা এই নীতি-উপদেশের প্রাচুর্যের জন্যই নয়; বরং এইজন্য যে এতে নগেন্দ্র, হীরা, সূর্যমুখী, কমলমণি প্রভৃতি নায়ক-নায়িকারা আমাদের সামনে দাঁড়ায় জীবন্ত মানুষেরই মতো। নগেন্দ্র ও হীরা তো দোষেগুণে বিশেষভাবে জীবন্ত, এমন কি সূর্যমুখী, যাকে আদর্শ সতীসাধ্বী জ্ঞানে অনেকে ভক্তি নিবেদন করে থাকে, তারও সাধ্বীত্ব কোনো অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনীর মতো করে' আমাদের সামনে দাঁড় করানো হয়নি, দাঁড় করানো হয়েছে আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত মানুষদের একজনের কাহিনী হিসাবেই। তাতে সদ্‌গুণের মাত্রা কিছু বেশি দেখানো হয়েছে, মিথ্যা নয়, কিন্তু তার অকৃত্রিম ভালবাসার কদর স্বামীর কাছে হলো না, সেই স্বামী আসক্ত হলো অন্য স্ত্রীতে, এজন্য তার যে বুকফাটা বেদনা তারই অঙ্কনে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের কৃতিত্ব। তাঁর এই ধরনের মর্মস্পর্শী আর চিন্তা-উদ্রেককারী ছবি আঁকার ক্ষমতা থেকেই বুঝতে পারা যায়, শুধু মানুষের বাইরের জীবনের ঘটনাবলী নয়, তার অন্তরের দুঃখ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, এসবের সঙ্গে লেখকের পরিচয় গভীর। নীতি-উপদেশের কথা তিনি অবশ্য প্রায়ই বলেন, কিন্তু তা বলেন মানুষের হিতৈষী হিসাবে—তাঁর রচনায় নীতি-উপদেশের চাইতে অনেক বড় ব্যাপার তাঁর এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কোনো ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে যদি সঙ্গতভাবে এই উক্তি করা যায় যে তাঁতে বাস্তবতা-বোধ কম তবে আসলে এই কথাই বলা হয় যে জীবন সম্বন্ধে কোনো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি। পর্যাপ্ত বাস্তবতা-বোধ যাঁতে নেই তিনি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নন, ঔপন্যাসিক তো ননই, একথা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কুশলী ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও পার্থক্য বাস্তবতা-বোধের

গভীরতা ও অগভীরতা নিয়ে নয়, সে-পার্থক্য মুখ্যত যুগ ও পরিবেশের পার্থক্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগের মানুষ সে-যুগে বাংলা দেশে জোরালো হয়েছিল জাতির পুনর্গঠনের প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক দুইজন খ্যাতনামা বাঙালী হচ্ছেন কেশবচন্দ্র সেন আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের প্রথম জন জাতির পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় জন, রাজনীতির ক্ষেত্রে। যাকে বলা হয় উদারমানবিক ও অসাম্প্রদায়িক জীবন-দর্শন তা কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ দুইজনকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকেও যে আকর্ষণ করেনি তা নয়; তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ছিল সাহিত্য-প্রতিভা বা শিল্প-প্রতিভা, অর্থাৎ যা সাধারণ ও ব্যাপক তাই নিয়ে তাঁর প্রধান কারবার নয়, তাঁর প্রধান কারবার যা বিশিষ্ট তাই নিয়ে; তাই দেশের বা জাতীয় জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে মনুষ্যত্ব-সাধনের কথাই ভাবেননি, তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন দেশের হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দুরূপ, এসবের পানেও। তাঁর এই প্রবণতার অন্যকারণও ছিল—সেইটি প্রবলতর,—তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিতদের একটি উল্লেখযোগ্য দল হয়ে পড়েছিলেন ইয়োরোপীয় রীতিনীতির অন্ধভক্ত—অন্তত এইই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল—তিনি রোধ করতে চেয়েছিলেন সেই গড্ডলিকা-প্রবাহ, বলতে চেয়েছিলেন, মানুষ এক হয়েও দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিচিত্র ও বিভিন্ন, সেই বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা উপেক্ষা করবার মতো বস্তু নয় আদৌ, উপেক্ষা করলে জীবন হয়ে পড়ে বাঁধনহীন ও রূপহীন, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তিত্বহীন।—শিল্পী সাহিত্যিকদের সামনে চিরদিনই দেখা দেয় এই বড় প্রশ্নটি—জীবনের ক্ষেত্রে এই 'সাধারণ' ও 'বিশিষ্টে'র যোগাযোগ কেমন হবে, কি রং কি রূপ গ্রহণ করে' তারা সার্থক হবে, এই সব। বলা বাহুল্য এই সব প্রশ্নের বিচিত্র উত্তর যুগে যুগে দেশে দেশে

শিল্পী-সাহিত্যিকরা দিয়েছেন। সব উত্তর যে সার্থক বা সন্তোষজনক হয়েছে তাও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরটি একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

তাঁর "চন্দ্রশেখরে"র প্রতাপ ও শৈবলিনীর কথা ভাবা যাক্। দুজনের ছেলেবেলাকার ভালবাসা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহিত হয়েও যৌবনে দুজনের প্রতি দুজনের প্রবল আকর্ষণ, এসব বঙ্কিমচন্দ্র আন্তরিকতার সঙ্গেই অঙ্কিত করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের জীবনে এমন সংকট যে দেখা দেয় সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন—যেমন সচেতন দেখি পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রকে তাঁর "দেবদাসে"। কিন্তু এই সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় কি? মনে হয় শরৎচন্দ্র এই সমস্যার কোনো কূল-কিনারা দেখতে পাননি—পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন। তিনি তাই তাঁর অপরিসীম-বেদনা-কাতর অন্তর নিয়ে শুধু চেয়ে দেখেছিলেন দেবদাস আর পার্বতীর জীবনের মর্মচ্ছেদী ব্যর্থতা, আর চোখের জল ফেলেছিলেন। এই সমস্যার দুরূহতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও তুল্যরূপে সচেতন; কিন্তু সেই দুরূহতার কথা ভেবে তিনি নিরস্ত হতে চাননি। তিনি এর মীমাংসা খুঁজলেন প্রতাপ, শৈবলিনী, শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর, তিন জনেরই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের সহায়তায়। প্রতিদিনের জীবনে এই সমস্যার বিচিত্র মীমাংসা অথবা গোঁজামিল নিয়তই আমরা দেখি; বঙ্কিমচন্দ্রের মীমাংসাও—গুরুগম্ভীর যোগবলের আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও—একটি গোঁজামিলই হলো, কেননা, এর ফলে শৈবলিনী যদি বা কোনো রকমে চন্দ্রশেখরের ঘরণী হলো (তাতে ক'রে হিন্দু-বিবাহ অচ্ছেদ্য এই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রক্ষা পেলো) প্রতাপ বরণ করলে অকাল মৃত্যু, যদিও কোনো দোষে দোষী সে নয়। এই মীমাংসায় বা কাহিনীর এই গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রও যে খুশী হতে পারলেন না তার পরিচয় রয়েছে রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নে প্রতাপের অন্তিম হৃদয়োচ্ছ্বাসে—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ-জগতে

মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে ?"...ইত্যাদি। এর সঙ্গে আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে : শরৎচন্দ্রের দেবদাস-পার্বতীও শেষ পর্যন্ত প্রতাপ-শৈবলিনীরই মতো 'অহিন্দু', কিছু করলো না। এর কারণ কি ? আমাদের বক্তব্য : এর কারণ আর্টে বিশেষের—এক্ষেত্রে বিশেষ হিন্দু-পরিবেশের—দাবির প্রবলতা। পরে শরৎচন্দ্র অবশ্য বহু দুঃসাহসের পরিচয় দেন। কিন্তু তখন যুগ ও পরিবেশের অনেক বদল হয়ে গেছে।

হয়তো প্রশ্ন হবে : শরৎচন্দ্র তাঁর দেবদাস ও পার্বতীর কাহিনী যেভাবে শেষ করলেন তাতে ভাবালুতা কিছু বেশি প্রকাশ পেলো —এটি তিনি লেখেন অল্প বয়সে ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর তাঁর পরিণত বয়সের রচনা, তাতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর কাহিনী তিনি যে ভাবে শেষ করলেন, তাঁর চিন্তাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও বলা যায়, তাতে কল্পনার অদ্ভুতত্ব কিছু অসঙ্গত রকমে প্রকাশ পেলো ; তবে কেন বলা হবে না, বঙ্কিমচন্দ্রে বাস্তবতাবোধ কম ?

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কল্পনা মাঝে মাঝে উদ্দাম ও অদ্ভুত হয়েছে একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, সেটি অলৌকিক অদ্ভুত এসবের প্রতি তাঁর মজ্জাগত আকর্ষণের জন্যই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারও মূলে দেশের ও জাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ধারণাই। ধারণা, idea, যে জবরদস্ত—অত্যাচারী—চিন্তাশীল মাত্রেই তা জানেন। তা কারণ যাই হোক কল্পনার উদ্দামতা, অদ্ভুতত্ব, এসব মোটের উপর দুর্বলতা—ভাবালুতার রকমফের। কিন্তু এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রে বাস্তবতাবোধ যে গভীর তার পরিচয় তাঁর "চন্দ্রশেখরে" আমরা কিছু পেলাম, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও, বিশেষ করে' মতিবিবি, হীরা, লবঙ্গলতা, অমরনাথ, ভবানন্দ, জেবউন্নিসা, হরবল্লভ, প্রভৃতি চরিত্রের পরিকল্পনায় তা সুস্পষ্ট। মনুষ্য-চরিত্রের জটিলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

যে যথেষ্ট সচেতন সেকথা অস্বীকার করবার উপায় আছে মনে হয় না, যদিও সেই সঙ্গে স্বীকার্য যে বড় রকমের ত্রুটিও তাঁর সাহিত্যে ঘটেছে। কিন্তু সেই ত্রুটি বাস্তবতা-বোধের ত্রুটি নয়, তাকে বলা যায় প্রত্যয়ের ত্রুটি—জীবনের মহত্তর পরিণতি সম্বন্ধে চেতনার কিঞ্চিৎ ক্ষীণতা। শিল্পী হিসাবে তিনি হিন্দুকে আঁকতে চাইলেন—সেটি কিছুমাত্র অসঙ্গত কাজ হয়নি; কিন্তু হিন্দুও যে মানুষ, তাই পরিবর্তন তারও জন্য সত্য, আর অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গত, এমন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের স্রোতোধারায়ই সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা পায়, জাতির ও দেশের নব নব সার্থক রূপান্তর ঘটে, আমাদের দেশের একালের জীবনের এই এক বড় প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁতে যোগ্য ভাবে দেখা দেয়নি—অবশ্য আংশিকভাবে কখনো কখনো দেখা দিয়েছে, যেমন "আনন্দমঠে"। সৌভাগ্যক্রমে এই সচেতনতা পরে আমরা ব্যাপক ভাবে পাই রবীন্দ্রনাথে। তাঁর জীবন-দর্শন আর বিশ্ব-দর্শনের প্রভাবে আর একালের বৃহত্তর জগতের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ব্যাপকতর পরিচয়ের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও কলাকৌশল অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চোখে ম্লান হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমাদের সাহিত্যে যে একটি বড় পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনা পরে পরে স্বতই এসে পড়বে। এখানে শুধু এই উল্লেখ কর্তব্য যে বঙ্কিম-সাহিত্য আর শরৎ-সাহিত্য এই দুয়ের মধ্যে সেতুর কাজ করেছে একখানি বই, সেখানি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাস—এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিকরা একমত। 'চোখের বালি'র সমসাময়িক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' বড় গল্প। সে গল্পটিও বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য ও শরৎ-সাহিত্য, অথবা আমাদের কথাসাহিত্যে বঙ্কিম-যুগ আর তার পরবর্তীযুগ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান যোগ্যভাবে সূচিত হচ্ছে 'চোখের বালি' উপন্যাসখানির দ্বারাই, কেননা, নারীর

পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও অধিকারের দাবি তাতে অকুণ্ঠিতভাবে করা হয়েছে। অবশ্য দাবির বেশি কিছু করা হয়নি—সেটিও 'বিশেষ পরিবেশে'র প্রভাবে এই আমাদের ধারণা—কিন্তু নারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও অধিকারের কথা এতে যে অকুণ্ঠিত চিত্তে উচ্চারণ করা হলো তারও ফল কম হয়নি, বাংলার একালের সাহিত্যে—এবং জীবনেও—তার পর্যাপ্ত পরিচয় আমরা পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র উপরে পড়েছে গ্যেটের Elective Affinities 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী' উপন্যাসখানির প্রভাব, একথা আমরা অন্যত্র বলেছি। গ্যেটের 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী'কে তাঁর চরিতাখ্যায়ক ও সাহিত্য-সমালোচকরা বলেছেন ইয়োরোপের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আদি বই। *

'চোখের বালি' † থেকেই শরৎচন্দ্র যে প্রথম বিশিষ্ট প্রেরণা পান সে সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন ঃ

> …বঙ্গদর্শনের নব পর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।

---

* 'কবিগুরু গ্যেটে' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

† 'চোখের বালি'র অব্যবহিত পরের 'নৌকাডুবি' থেকেও শরৎচন্দ্র প্রচুর প্রেরণা পান মনে হয়। সে-প্রেরণা হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু-দাম্পত্য-আদর্শের প্রেরণা। মানুষ হিসাবে নারীর পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি আর প্রাচীন হিন্দু-দাম্পত্য-আদর্শ, এই দুয়েরই প্রবল প্রভাব দেখা যায় শরৎচন্দ্রের চিন্তায় ও সৃষ্টিতে।

অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায় একথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?" ঞ

'চোখের বালি' থেকে শরৎচন্দ্র যেমন এক ধরনের প্রেরণা পান তেমনি তারও আগে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল," বিশেষ করে' তার 'রোহিণী' চরিত্র থেকে, তিনি এক ধরনের প্রবল বিতৃষ্ণাও লাভ করেন। রোহিণী সম্পর্কে তাঁর পরিণত সাহিত্যিক জীবনে এই মন্তব্য তিনি করেন ঃ

আমার মনে আছে ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে গেল। তারপরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ, হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো! কিন্তু আর একটা দিক ? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম ?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেচে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে idea-র জবরদস্তি ছিল আমরা জেনেছি। তাঁর রোহিণী চরিত্র সেই জবরদস্তির এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ত্রুটির বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ এমন জোরালো যে তা কাটবার ক্ষমতা কারো আছে তা মনে হয় না। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ'ও শরৎচন্দ্রের মনে

ঞ 'জয়ন্তী উৎসর্গ' দ্রষ্টব্য।

বিরূপতা উৎপাদন করেছিল, তারও পরিচয় তাঁর লেখায় রয়েছে। *

বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ভিন্ন আর এক ধরনের প্রভাবও তাঁর উপরে পড়ে নবযৌবনেই—সেটি সমাজতত্ত্ব, মানবসমাজের প্রাচীন ইতিহাস, অভিব্যক্তিবাদ, ইত্যাদি সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার, টাইলার প্রমুখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের চিন্তা। তাঁর "নারীর মূল্য" লেখাটিতে তাঁর চিন্তা-ভাবনার এই দিকটা ভাল রূপ পেয়েছে। তিনি নিজেও বহুবার বলেছেন, সাহিত্যের চাইতে বিজ্ঞানের বইপত্রই তিনি ঘেঁটেছেন বেশি।—কিন্তু বইপত্র তিনি যতই ঘাঁটুন তাঁর সত্যকার অবলম্বন কোনো গ্রন্থ বা তত্ত্ব তেমন নয় যেমন তাঁর অতিশয়-পরদুঃখকাতর হৃদয় আর তাঁর নিজের 'প্রচণ্ড' অভিজ্ঞতা। নিজের সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'চন্দননগরে আলাপ-সভা'য় অনেক মূল্যবান কথা তিনি বলেন; তার থেকে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি:

> ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার একটা ঝোঁক ছিল। মনের ভিতর থেকে একটা বাসনা হত—যা বাইরে পাঁচ রকম দেখছি শুনছি তার একটি রূপ দেওয়া যায় না? হঠাৎ একদিন লিখতে শুরু করে দিলাম। প্রথমটা অবশ্য এ'র ও'র চুরি করেই লিখতাম। অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না।...বলেছি—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—আমাকেও চার পাঁচবার সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করেন সবই করেছি। গাঁজা মালপো কিছুই বাদ যায়নি।...
>
> বিশ বছর এইটা গেল। ঐ সময় খানকতক বই লিখে ফেললুম। 'দেবদাস' প্রভৃতি ঐ আঠার-কুড়ির মধ্যে লেখা। তারপর গান বাজনা শিখতে লাগলুম। পাঁচ বৎসর ঐতে

* শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' দ্রষ্টব্য।

গেল। তারপর পেটের দায়ে চলে গেলাম নানাদিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা তাই থেকে। এমন অনেক কিছু করতে হ'ত যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়িনি। দেখতে থাকতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হতো। সমস্ত island গুলো (বর্মা, জাভা, বোর্নিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভাল নয়—smugglers. এইসব অভিজ্ঞাতার ফল "পথের দাবী"। বাড়ীতে বসে আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয়না অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না। এঁরা করেন কি—বই থেকে একটা 'ক্যারেকটার' নিয়ে তাকেই একটু অদল-বদল করে আর একটা ক্যারেকটার সৃষ্টি করেন। মানুষ কি তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না। সে সব অভিজ্ঞতা আমার মনের ভেতরে থাকতে লাগলো। আমার memory-টা বড্ড ভাল।···

আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বললে, সে বললে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোনদিন ছিল না।···concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না। নিজের অভিজ্ঞতা চাই। পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না। আমার বাড়ীতে যে বই আছে তার অধিকাংশই সায়েন্সের বই।···রূপের বর্ণনা স্বভাবের বর্ণনা (আমার) বইয়ের মধ্যে প্রায় নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই, বেশি নজর দিই না। আসল বস্তু, তার সত্তা বা মন যাহাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা। সেইটা উপলব্ধি করবার জন্য চাই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। আমার অভিজ্ঞতা কি করে সঞ্চয়

করেছি তার details বলবার প্রয়োজন নেই—সব বলবার মতও নয়। মানুষ (সংস্কারবশতঃ বা দুর্বলতা হেতু) সে-সব সহ্য করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটায় (কবিতায় *) যেমন আছে (বিষ যেটা) সেটা শুধু আমারই উপরে পড়লো—তা থেকে যা বেরিয়ে এলো, সেটা সকলকে দিয়েছি (আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে)। অনেকে বলে থাকেন এবং rightly বলে থাকেন—আপনার চরিত্র পড়লে মনে হয় যেন এরা কল্পনার বস্তু নয়। আমার চরিত্র-গুলির 90% basis সত্য। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে সত্যি মাত্রই সাহিত্য নয়। এমন অনেক সত্যি আছে যা সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে না। কিন্তু সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই—যাই বললে অস্বাভাবিক, অমনি বদলে ফেলতে হয় না। আমি যে চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যা পরিণতি দেখেছি তাই লিখেছি। তাই আমার ভয়ের কারণ নাই। লোকে সেগুলোকে অস্বাভাবিক বললে আমি মানব না।···

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁর জাতির লাভ হয়েছে দুইটি বড় সম্পদ—একটি তাঁর অপূর্ব-অভিজ্ঞতাভরা জীবন, অপরটি তাঁর সাহিত্য। তাঁর সেই জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হবার সুযোগ আজো তাঁর দেশবাসীদের হয়নি। কবে হবে, অথবা আদৌ হবে কি না, তাও বলা কঠিন, কেননা, তত্ত্বের মতো তথ্যও যে মহামূল্য সে-চেতনা আজো আমাদের দেশে ক্ষীণ। আমরা এই আলোচনায় তাই চেষ্টা করবো তাঁর যে সাহিত্য আমাদের লাভ হয়েছে প্রধানত তার মূল্য একটু বুঝে দেখতে।

---

* জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।—চৈতালি।

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের লেখা কয়েকখানি বই নষ্ট হয়ে গেছে। যা আছে তার মধ্যে থেকে তুখানি বেছে নেওয়া যাক্ তাঁর প্রথম জীবনের রচনার নিদর্শন হিসাবে —'দেবদাস', তাঁর আঠারো থেকে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা, আর 'শুভদা,' তাঁর বাইশ বৎসর বয়সের লেখা। এই তুইখানি বই থেকেই অনেকখানি বোঝা যাবে শরৎচন্দ্রের সেই বয়সের চিন্তা-ভাবনার গতি আর বিশেষ করে, তাঁর আঁকবার শক্তি তখন কেমন ছিল। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশ বৎসরের কাছা-কাছি বয়সের মধ্যেই প্রতিভাবানরা তাঁদের প্রতিভার পরিচয় অনেকখানি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বছর একুশ বয়সের লেখা ; গ্যেটে তাঁর 'প্রমেথেউস' আদি বিখ্যাত খণ্ড কবিতা প্রায় ঐ বয়সেই লেখেন।—'দেবদাস' পরবর্তী জীবনে কতখানি মার্জিত হয়েছিল তা জানা যায়নি ; কিছু যে হয়েছিল তা অনুমান করা যায় এর পরের রচনা 'শুভদা'র সংলাপের ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে—শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি 'দেবদাসে' অনেক বেশি স্পষ্ট। তবু দেবদাস ও পার্বতীর পাঠশালার জীবন, পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে' কিছুদিন তাদের মাঠে-বাটে বনে-বাদাড়ে পাড়ায়-পাড়ায় উৎপাত করে বেড়ানো, বাঁধে নেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল ঘোলা করে' পুঁটিমাছ ধরা আর জলে ডুবে ডুবে চোখ লাল করা, তাদের বাল্য-জীবন ও বাল্যকালের ভালবাসা সম্পর্কে এই সব সহজ ও মধুর ঘটনা-বিন্যাস—এ সব যে তাঁর প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা ভাবা কঠিন ; আর সেই জন্যই বিস্মিত হতে হয় এত অল্প বয়সে লেখকের মধ্যে প্রেম ও তার গতি-পরিণতি সম্বন্ধে এতটা তীক্ষ্ণ চেতনা দেখে। চন্দ্রমুখীর চরিত্র পরবর্তীকালে স্পষ্টতর রূপ লাভ করেছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

প্রেম সম্বন্ধে এই গভীর চেতনা 'দেবদাসে'র বছর তুয়েক পরে

লেখা 'শুভদা'য় আরো স্পষ্ট ভাবে পাই—'শুভদা' যে প্রায় অমার্জিত অবস্থায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহের সম্পাদক আমাদের সে কথা জানিয়েছেন। 'শুভদা'য় প্রেমের নানা ধরনের চিত্র তরুণ লেখক আঁকতে চেষ্টা করেন, তা আমরা পরে দেখবো। এতে প্রেম সম্বন্ধে ধারণা যেখানে একটি লক্ষণীয় গভীরতা লাভ করেছে, আর তার ফলে লেখকের বাণী বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তারই দিকে আগে তাকানো যাক্। গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা ললনা (মালতী ছদ্মনামে পরিচিতা) শারদাচরণকে ভালবাসতো, সে ভালবাসাও অকৃত্রিম—পরবর্তী জীবনেও তার মন থেকে তা মুছে যায়নি। তবু সে-ভালবাসা তেমন কোনো গভীর পরিণতির দিকে যায়নি। কিন্তু জল থেকে যে তাকে উদ্ধার করলে সেই সুরেন্দ্রনাথের গভীর সমবেদনা শ্রদ্ধা আর প্রাণঢালা ভালবাসা লাভ করে' তার মন প্রেমের এমন এক উচ্চগ্রাম স্পর্শ করলো যে সুরেন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষার চিন্তা তার মনে সব চাইতে প্রবল হলো, তার জন্য তার নিজের মানমর্যাদা বিসর্জন দিতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলো। সত্যকার প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক বা প্রেমিকার পক্ষে এমন আত্মবিলোপ—শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'আত্ম-বলিদান'—যে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বাইশ বৎসর বয়সের উক্তি এই ঃ

> জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসিতে যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতেই হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম।···যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি···আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে মানুষ ভালবাসিয়া

ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু-বিসর্জন ভগবান-পদ-প্রান্তে পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্ম-বলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও ত পূর্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

শরৎচন্দ্রের ভাষার শক্তি ও মাধুর্য পরে এর চাইতে অনেক বাড়ে, কিন্তু আত্মবিলোপকারী প্রেমের যে মর্যাদার কথা তিনি এখানে ভেবেছেন তার চাইতে তার উচ্চতর কোনো মর্যাদার কথা পরে তিনি ভাবতে পেরেছেন মনে হয় না। অবশ্য পরে জীবন সম্বন্ধে আরো অনেক ব্যাপক, সময় সময় আরো গভীর চেতনার পরিচয় তিনি যে দেন তা যথার্থ। প্রেমে অকুণ্ঠিত আত্মবলিদান নরনারীকে জীবন্মুক্তির অধিকারী করে, শরৎচন্দ্রের এই যে প্রথম যৌবনের ধারণা এটি পরে পরে তাঁর ভিতরে কি পরিণতি পায় তাও আমরা দেখবো।

'শুভদা'য় শরৎচন্দ্র চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় কেমন দিয়েছেন সেটিও বুঝবার মতো। চরিত্রগুলো আমাদের সুপরিচিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ে পুরুষ—ভাল, মন্দ, ভালয় মন্দে মেশানো, সব রকমেরই। কিন্তু সবগুলোই স্পষ্ট—যেগুলো অপ্রধান চরিত্র, যেমন, কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী, বিন্দুবাসিনী, রাসমণি, এরাও যে একটি অপরটি থেকে পৃথক, তা সহজেই চোখে পড়ে। তবে চরিত্রগুলো খানিকটা type-জাতীয়—এদের কেউ যে নতুন কোনো ধারা নেবে তা যেন ভাবা যায় না। তবু লেখক এদের বিশেষ বিশেষ ভাবের পুতুল করেই গড়েননি, এরা মোটের উপর বাঙালী মধ্যবিত্ত মেয়ে

পুরুষই, অনেকখানি নির্জীব ও গতানুগতিক বটে, কেননা সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন তাই, কিন্তু তবু প্রাণহীন বিশেষ-ভঙ্গিযুক্ত পুতুল এরা নয়। একটি চরিত্র নেওয়া যাক—শারদাচরণের পিতা হরমোহন। হরমোহন কৃপণ। তার ছেলেও তাকে কৃপণ ও অর্থ-পিপাসু বলেই জানে, তাই ইচ্ছা থাকলেও বিনাপণে ললনার ভগিনী ছলনাকে বিয়ে করবার কথা তার কাছে তুলবার সাহস তার হয়নি। সেই বৃদ্ধ বিষয়ী হরমোহনও যখন বুঝলো, ছলনার বিবাহের পণ বাবদ হাজার টাকা কাউকে না জানিয়ে তারই মতো ছলনাদের প্রতিবেশী সদানন্দ তাকে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছে, তখন সে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করলো। অবশ্য সে-লজ্জায় কোনো ফল হলো না; টাকা সে নিলে।

আমরা বলেছি 'শুভদা'র বিভিন্ন চরিত্রে প্রেমিক-জীবনের বিভিন্ন ছবি তরুণ শরৎচন্দ্র দেখেছেন। প্রথমেই নেওয়া যাক্ শুভদাকে। শুভদা একান্ত সেবাপরায়ণা পতিব্রতা গৃহস্থ-বধূ। যেদিন সুদিন ছিল সেদিন যেমন সে নিঃশব্দে অনলসভাবে সংসারের ও স্বামীর সেবা করতো, স্বামীর দুর্মতির জন্য যখন দুর্দিন নেমে এলো সেদিনেও দেখা গেল সে তেমনি সেবাপরায়ণা—অপদার্থ এমন কি অপরাধী স্বামীর প্রতিও কিছুমাত্র অভিযোগ তার নেই, বরং তার প্রতি তার মমতার মাত্রা যেন আরো বেড়েছে। কঠিন অভাব-অনটনের মধ্যেও এমন অসাধারণ ধৈর্য আর স্নেহ-মমতা—এতে তাকে শরৎচন্দ্র-যুগের অনেক লেখকই হয়তো দেবীর আসনে বসিয়ে স্তব-স্তুতি আরম্ভ করতেন। কিন্তু তরুণ শরৎচন্দ্র শুভদা সম্পর্কে কোনো উচ্ছ্বাস দেখাননি। তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত বাঙালী ঘরের এক অসীম-মমতায়-ভরা বধূ ও মাতাকে। অবশ্য আরো বহু মমতাময়ী নারী শরৎচন্দ্র অঙ্কিত করেছেন, মমতাময়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে তেজোময়ীও তারা কম নয়; কিন্তু শুভদার মতো চরিত্রও যে আমাদের চোখে

না পড়ে তা নয়। জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে সংস্কার হয়তো তার এমন সহ্য-গুণের মূলে। শরৎচন্দ্র অবশ্য সেসব কথার উল্লেখ করেন নি। নারীর মাতৃরূপ শরৎচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু হয়েছে আমরা জানি ; শুভদা তাঁর আঁকা প্রথম স্মরণীয় মাতৃমূর্তি।

শুভদার জ্যেষ্ঠা কন্যা ললনার কথা বলা হয়েছে। ললনা যার আশ্রয় পেলো ও পরে বিবাহিত স্ত্রী হলো সেই সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রেও প্রেমের একটা দিক দেখানো হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ ধনী জমিদার, বিপত্নীক, গান বাজনায় আর নর্তকীর সংস্রবে তার দিন কাটে। তারই বজরায় লাভ হলো ললনার স্থান। ললনা নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বললে তার নাম মালতী। মালতীকে দেখে মুগ্ধ হতে সুরেন্দ্রনাথের বেশি সময় লাগলো না। তবু কোনো অশোভন ব্যবহার মালতীর প্রতি সুরেন্দ্রনাথ করলো না। মালতীর একান্ত ইচ্ছা সে কলকাতায় যাবে ; শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ তাতে রাজী হলো। এদিকে যে নর্তকী মেয়েটি তার সঙ্গে ছিল সে একদিন নৌকোয় বেড়াতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে গেল। তার শোকে সুরেন্দ্রনাথ বিমনা হলো—ভাবলো, কার পাপে এমন হলো। ললনাকে সে কলকাতায় তার এক বন্ধুর বাসায় পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করলো। কিন্তু ললনা যখন সত্যই যাবার জন্য পা বাড়ালো তখন সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অধীর হলো। তার গভীর প্রেমে ললনা সাড়া দিল। সুরেন্দ্রনাথ নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন, সে জানে সে ভোগী, প্রেমিক নয়, তাই চাইলো ললনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে ; কিন্তু তাতে সুরেন্দ্রনাথের সম্মানের হানি হবে ভেবে ললনা ঘোর আপত্তি করলে। সুরেন্দ্রনাথ তার সে আপত্তি শুনলো না। সদানন্দের সঙ্গে যখন তার দেখা ও আলাপ হলো তখন সে বুঝলো সদানন্দ ললনাকে গভীর ভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাতে সে ঈর্ষান্বিত হলো না। সে ললনাকে বললে—আমি যে বিষ খেয়েছি সদানন্দও সেই বিষ খেয়েছে।

সদানন্দ চরিত্রটিও লক্ষণীয়। সে আধ-পাগলা। তাই বলেই তাকে সবাই জানে। কিন্তু আসলে সে সংসারে খুব গা মাখাতে চায় না—রামপ্রসাদী গায় আর শক্তি অনুসারে পরের কাজে লাগতে চেষ্টা করে। তার স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ করেনি। তার কেউ নেই, সেজন্য উদ্যোগীও কেউ হয়নি। অত্যন্ত অভাবে পড়ে ললনা একদিন তার কাছে কিছু সাহায্যের জন্য গেল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না। সদানন্দ তার মনের ভাব বুঝলো, বুঝে সমাদর করে' তার প্রার্থনার অতিরিক্ত অর্থ তাকে দিল। ললনা তাকে ডাকতো সদা-দাদা বলে, দাদার মতোই তাকে ভালবাসতো ও ভক্তি করতো। সদানন্দের ব্যবহারও ছিল তার প্রতি সহজভাবে স্নেহময়, তার বেশি যে আর কিছু তা যেন সে জানতো না। কিন্তু আসলে এটি ছিল প্রেম—প্রেমের আত্মনিবেদন, প্রতিদানের কোনো আশা না রেখে, হয়ত বিশেষ করে' এইজন্য যে ললনা ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা।

'শুভদা'র হারাণ চরিত্রটি খুব বিশিষ্ট। তার সামান্য চাকরির আয়ে সংসার এক রকম চলে যাচ্ছিল; কিন্তু তার বারবনিতাতে আসক্তি, নেশাভাঙ করা, জুয়াখেলা, এসব বিপদ ডেকে আনলো। তার চাকরিটি গেল। জেলে যাওয়া থেকে সে রক্ষা পেলো মনিবের দয়ায়। কিন্তু তার চৈতন্য হলো না, ভাবলে আর একটি চাকরি সহজেই জোগাড় করে' নেবে। সে আশা অবশ্য তার পূর্ণ হলো না। তখন দূরে দূরে ভিক্ষার চেষ্টা সে করলো; তাতেও ঘোরা-ফেরাই সার হলো। পাড়া-প্রতিবেশীদের যৎসামান্য দানে কোনো রকমে সংসার চলতে লাগলো। ওদিকে তার একটি ছোট ছেলে দীর্ঘদিনের ব্যারামে মর-মর, কিন্তু সে-চেতনা হারাণের নেই। এই অবস্থায়ও স্ত্রীর কাছ থেকে দুই এক আনা চেয়ে-চিন্তে নিয়ে সে ছোটে গাঁজাগুলি আর জুয়ার আড্ডায়। তার বড় মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিল, ছেলেটি ভুগে ভুগে মারা গেল, এ সবে সে দুঃখিত যে

না হলো তা নয়, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তার গাঁজাগুলি আর জুয়ার নেশাই তার জন্য সার হলো। শেষ পর্যন্ত সদানন্দের সাহায্যে তাদের সংসার চলতে লাগলো। বইখানির শেষে দেখা যাচ্ছে হারাণ জানতে পেরেছে তার স্ত্রীর বাক্সে পঞ্চাশটি টাকা এসে জুটেছে। সে মুখে গায়ে কালি মেখে আর তার উপরে চুনের ফোঁটা দিয়ে মোটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে থেকে দরজা খুলে শুভদার কামরায় ঢুকে ভারি গলায় বাক্সের চাবি চাইলে। প্রথমে ভয় পেলেও শীগ্‌গিরই শুভদা সব বুঝলো। উঠে বসে বালিশের নীচে থেকে চাবির থোলো নিয়ে সামনে ফেলে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, "আমার বড় বাক্সর ডানদিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে তাই নিয়ো—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে তাতে যেন হাত দিও না।" হারাণের টাকা নিয়ে যাবার সময় সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৃদুকণ্ঠে বললে, "নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙিয়ো।"

বোঝা যাচ্ছে হারাণের শোধরানোর কোনো আশাই আর শুভদা রাখে না। আমরা দেখেছি শুভদাকে শরৎচন্দ্র আঁকতে চেয়েছেন এক মহনীয়া মাতারূপে—মাতার অপরিসীম স্নেহমমতা তাতে, সেই সঙ্গে মাতার অপরিসীম বেদনা-বোধ আর ক্ষমা। কিন্তু হারাণের চরিত্রে তিনি কি দেখাতে চেয়েছেন? হারাণের চরিত্রে ভাল প্রায় কিছুই নাই। প্রথম দিকে তাতে একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, পরে তার অস্তিত্বও আর বুঝতে পারা যায় না। এর উপর বামনাই-য়ের দম্ভও যে একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আঁকা হয়েছে এক সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন গেঁজেল আর জুয়াড়ী করেই—সেই সবের নেশাই তার জীবনে চরম ও পরম হলো। কিন্তু এমন একটা অপদার্থকেও তরুণ লেখক এঁকেছেন যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে। কেন? বোধ হয় প্রধানত এইটি দেখাতে যে গাঁজাগুলি জুয়া এসবের নেশা এই দুর্বলবুদ্ধি অভাবগ্রস্ত লোকটাকে কোন্

অতলে তলিয়ে নিয়ে গেল। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কদাচার এসবের প্রভাবে আমাদের পল্লীর মধ্যবিত্ত জীবন কতটা ভেঙে পড়েছে হারাণ যেন তারই একটা দৃষ্টান্ত। হারাণকে তিনি ঠিক ঘৃণা করেন নি, কিন্তু পরে পরে আঁকা মন্দ চরিত্রগুলোকে, যেমন 'দত্তা'র রাসবিহারী, 'মহেশে'র ন্যায়রত্ন, 'দেনা পাওনা'র শিরোমণি, জনার্দন রায় এদের তিনি রীতিমতো ঘৃণা করেছেন।

'শুভদা' সম্বন্ধে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। এর ভাষার উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট। বঙ্কিম-চন্দ্রের কোনো কোনো মত বা ধারণার প্রতি শরৎচন্দ্র নবযৌবন থেকেই বিরূপ ছিলেন। তবু তাঁর ভাষার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মিত তীক্ষ্ণ বাচন-ভঙ্গি আর 'সাধনা' ও নবপর্যায়-'বঙ্গদর্শনে'র যুগের রবীন্দ্রনাথের ভাষার অপরিসীম লালিত্য তাঁর ভাষার গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল মনে হয়।

'দেবদাস' ও 'শুভদা' এই দুই উপন্যাসেই দেখা যাচ্ছে প্রেমে আত্মনিবেদন লেখকের বড় বিষয়। তাঁর যে এই কালের ধারণা, এমন আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়ে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়, তাও স্মরণীয়। এমন আত্মনিবেদনের বা আত্মবলিদানের ভিতর দিয়ে মানুষ জীবন্মুক্ত হয় কি না—জীবন্মুক্তি ব্যাপারটাই বা কি—এসব দুরূহ প্রশ্ন। তবে মুক্তির অর্থ অবন্ধন, জীবন্মুক্তির অর্থ তেমনি হতে পারে দৈনন্দিন জীবনের বহু বন্ধন সত্ত্বেও একটা অবন্ধনের ভাব; মন যদি কোনো একটি কেন্দ্রে সংহত হয়, ক্ষুদ্র লাভালাভের চিন্তার দ্বারা বিক্ষুব্ধ না হয়, তবে এমন অবন্ধন বা স্থৈর্য বা বেপরোয়া ভাব অনেকখানি লাভ হয় বটে। হতে পারে নবযৌবনে প্রেমে চিত্তকে এমন সংহত করতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তী জীবনে শরৎচন্দ্র অমন সমবেদনাপরায়ণ আর নিপুণ পর্যবেক্ষক হয়ে উঠেছিলেন।—

শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের 'বড় দিদি' ও 'চন্দ্রনাথে'ও দেখা যায় আত্মভোলা প্রেমের দিকে তাঁর পক্ষপাত।

এই প্রথম যুগে শরৎচন্দ্রের অঙ্কন ক্ষমতাও মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়েছে। বিশেষ করে 'বড় দিদি'র প্রথম অংশে, অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের মাধবীদের গৃহ ত্যাগ করে' যাওয়ার আগে পর্যন্ত। তবে তাঁর এই যুগের চরিত্রগুলো মোটের উপর অ-জটিল, তাদের মনের দ্বন্দ্বও তেমন জোরালো হয়ে দেখা দেয়নি।

একটি লেখায় আমরা শরৎ-সাহিত্যকে ভাগ করেছিলাম দুই বড় ভাগে—প্রাক্-শ্রীকান্ত আর শ্রীকান্তোত্তর। এই বিভাগ মোটের উপর কাজের বলেই মনে হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের যেসব নামকরা ছোট উপন্যাস, যেমন, 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ-বৌ', 'পণ্ডিত মশাই', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'পল্লীসমাজ', এগুলো বেরোয় শ্রীকান্তের আগে। তাঁর বড় উপন্যাসগুলোর মধ্য 'চরিত্রহীন' শ্রীকান্তের পূর্ববর্তী, তবে বই আকারে বেরোয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব' যে বৎসরে বেরোয় সেই বৎসরে। তাঁর ছোট নামকরা উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'বামুনের মেয়ে' 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে'র পরবর্তী—তার প্রকাশের সন ১৯২০। বলা বাহুল্য এই বিভাগে আমাদের লক্ষ্য শরৎচন্দ্রের চিন্তাভাবনার ও অঙ্কন-ক্ষমতার গতি-পরিণতির দিকে। প্রাক্শ্রীকান্ত যুগের উপন্যাসগুলোয় সাধারণত শরৎচন্দ্রকে দেখা যায় কিছু বেশি ব্যক্তি-সচেতন, অর্থাৎ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার মানসিক দ্বন্দ্ব, এই সব যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার দিকে তাঁর নজর বেশি। কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র বিভিন্ন পর্বে ও সেই কালের অন্যান্য উপন্যাসে তিনি যে ব্যক্তিসচেতন নন তা নয়, তবে সেই সঙ্গে, অথবা তার চাইতে বেশি, পরিবেশ-সচেতন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের ব্যাখ্যার দিকেও বেশি যত্নশীল। তাঁর সবগুলো নামকরা উপন্যাসের আলোচনার সুযোগ যে আমাদের

হবে না, তা বলাই বাহুল্য। প্রাক্‌শ্রীকান্ত বিভাগে 'বিরাজ-বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন' আর শ্রীকান্তোত্তর বিভাগে 'শ্রীকান্তে'র বিভিন্ন পর্ব, 'গৃহদাহ', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনা পাওনা', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'বিপ্রদাস', এইগুলো সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। তাঁর ছোট গল্পগুলো সম্বন্ধেও অবশ্য কিছু আলোচনা আমাদের করতে হবে।

আমরা বলেছি, শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষের দিকে তাঁর জীবন-দর্শন ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জীবন-দর্শন মানুষের চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুভূতি-আবেগ, এসবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; তাই ভাষায় স্পষ্ট রূপ পাবার আগেও তা অক্রিয় থাকে না। তাঁর জীবন-দর্শনের একটি বড় সূত্র শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন:

> ···মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত···তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডারটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটি কি একটি বারও মনে পড়ে না? এও কি মনে পড়ে না এটা সীমাহীন আত্মার আসন।

শরৎচন্দ্র বহুবার বলেছেন তিনি নাস্তিক, ধর্ম বলতে আমাদের দেশে যা বোঝায় তার বিশেষ কোনো আবেদন তাঁর কাছে নেই তাঁর কথা মিথ্যা ভাবার দরকার করে না। কিন্তু এও সত্য যে আমাদের দেশে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার প্রভাব তাঁর উপরে কম নয়। 'শুভদা'য় আমরা দেখেছি তিনি ভাবছেন, প্রেমে আত্মোৎসর্গ জীবন্মুক্তি ঘটায়—'শুভদা' লেখার পূর্বে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন

তা আমরা জানি—আর 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে' দেখছি তিনি বিশ্বাস করেন, 'মানুষের অন্তর জিনিসটা অনন্ত— সীমাহীন আত্মার আসন'। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে এমন কিছুর সন্ধান তিনি পেয়েছেন যা দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ বুদ্ধি-বিচারের অতীত, যদিও বাস্তবের দিকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টি একথা তিনিও জানেন আমরাও জানি। জটিলতা বাদ দিয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় বলা যায়, মানুষের চেতনমনের মতো, অথবা তার চাইতেও, তার অবচেতন মন বেশি শক্তিশালী, এটি শরৎচন্দ্রের একটি প্রবল ধারণা। তাঁর প্রাক্-শ্রীকান্ত যুগের উপন্যাসগুলোয় মানুষের, বিশেষ করে' নারীর, চেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব তাঁর নিপুণ চিত্রণের বিষয় হয়েছে, সেই চেতন ও অবচেতন মনের কার্যকলাপের সঙ্গে অবশ্য মিশে রয়েছে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের যে পরিবেশে জন্ম সেই পরিবেশের ধর্মাচার, সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার, ইত্যাদি সম্বন্ধে মনোভাব বা সেসবের অদৃশ্য প্রভাব।

তাঁর বইগুলোর একটু বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা যাক্, তাতে তাঁর জগৎ, তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর রচনা-কৌশল, এসবের সঙ্গে অনেকটা সহজে আমরা পরিচিত হতে পারবো।

বিরাজ বৌ

'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। এটি ঠিক কখন রচিত হয়েছিল তা আমরা জানি না ; তবে এর ভিতরকার চিন্তা-ভাবনা বা মনোভাব শরৎচন্দ্রের রচনার প্রথমযুগ-ঘেঁষা, কিন্তু লিপি-চাতুর্য, বিশেষ করে' বিরাজের গৃহ-ত্যাগের আগে পর্যন্ত, সুপরিণত। স্বামী ও সংসার নিয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রখর-ব্যক্তিত্বশালিনী পরমস্নেহময়ী বিরাজ গভীর সন্তোষেই দিন যাপন করছিল। কিন্তু তার সেই

সুখের নীড়ে বাজ পড়লো স্বামীর অবিবেচনায়—সে সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে' ভগিনীর বিবাহ দিলো—আর তারপর দেখা দিলো কয়েক বছর ধরে অজন্মা। অভাব অনটন আরো মর্মাতিক হলো বিরাজের স্বামী নীলাম্বরের অকর্মণ্যতার জন্য ; মনের দিক দিয়ে সে সোনার মানুষ, পাড়ার দশজনের কাজে খাটতে সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু অর্থ উপার্জন কেমন করে' করতে হয় তার কিছুই সে শেখেনি—সে দিকে আগ্রহও তার নেই। বিরাজের চেতনা প্রখর, তাই দুঃখবোধও প্রখর, আর এদুঃখ তার নিজের জন্য নয়, তার স্বামীরই জন্য—যে স্বামীর গায়ে এতকাল সে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেয়নি। স্বামীর অবিবেচনাই এমন অনর্থের মূলে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরমপ্রেমময়ী বিরাজ কারণে অকারণে কঠিন বাক্যবাণে স্বামীকে বিদ্ধ করে' চললো। এই পরিস্থিতিতে আর এক বিপদ এসে জুটলো—জমিদারপুত্র রাজেনের চোখ পড়লো বিরাজের অসামান্য রূপের উপরে, সে বিরাজের দাসীর মারফত তার মনোভাব ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেলো, সঙ্গে সঙ্গে বিরাজদের ঘাটের ঠিক ওপারে বজরা বেঁধে চার করে' মাছ ধরার বিপুল আয়োজন করলো, আর বিরাজদের পাড়ায় পাখী শিকার করে' ফিরতে লাগলো। বিরাজ সব বুঝলো। একদিন তাদের ঘাটের কাছে বন্দুক হাতে রাজেনকে দেখে সে তাকে রীতিমতো ভৎর্সনা করলো। সেই দৃশ্য তার দেবর পীতাম্বরের চোখে পড়েছিল। সে বিকৃত করে' সেই সংবাদ দিলো ভ্রাতা নীলাম্বরকে আর নিজের স্ত্রীকে কড়া শাসন করলো। নীলাম্বর এসব কথা আদৌ বিশ্বাস করলো না, উল্টে পীতাম্বরকে শাসন করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবে ও কটূক্তিতে সে জ্ঞান-হারা হলো। এক দুর্যোগের রাত্রিতে বিরাজ পাড়ায় বাগ্‌দিদের বাড়ীতে চাল ধার করতে গিয়েছিল ; ফিরে এলে নীলাম্বর তাকে অসতী বলে' গালি দিলো, আর কথা কাটাকাটিতে রেগে শূন্য পানের ডিবা তাকে ফেলে মারলো। বিরাজ অপমানে ক্রোধে

আত্মহারা হয়ে নদীতে ডুবে মরতে গেল। কিন্তু মনের বিকারে নদীতে ঝাঁপ না দিয়ে সে দাসীর সঙ্গে রাজেনের বজরায় গিয়ে উঠলো। সেখানে সম্বিৎ ফিরে পেতেই সে নদীতে ঝাঁপ দিলো। নদী থেকে সে কোনো রকমে উঠলো; দীর্ঘকাল হাঁসপাতালে তার কাটলো বাতশ্লেষ্মা বিকারে; তারপর দৈবক্রমে স্বামীর দেখা পেলো বহু দুঃখ ভোগের পরে এক-চক্ষু হীন আতুর পথের ভিক্ষুক অবস্থায়। স্বামী তাকে পরম সমাদরে উঠিয়ে আনলো। অল্প দিনেই তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পূর্বে কোনো রকমে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সে বললে, "আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হলো— আর কিছু নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ—এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে।"

কাহিনীটি অতিশয় করুণ, কিন্তু সাধারণ—ঘটনার বিশেষ কোনো চমক এতে নেই। কিন্তু এর বর্ণনা-কৌশল, বিশেষ করে' বিরাজের গৃহত্যাগের আগে পর্যন্ত, অনবদ্য *। সংলাপ সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার প্রকাশ-সামর্থ্য অসাধারণ—বিরাজ, নীলাম্বর, পীতাম্বর, পীতাম্বরের স্ত্রী মোহিনী, সবারই মূর্তি সেই মিতভাষণ ও বর্ণনার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সামনে।

---

*বিরাজ যখন নদীতে ডুবে মরার সংকল্প নিয়ে "আঁচল দিয়া হাত-পা বাঁধিতেছিল তখন কোথায় বাজ পড়িল; সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে ওপারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল।...বিরাজ সহসা ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সাধুপুরুষ আমার হাতের জল পর্যন্ত খাবেন না কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!"

নারী-চিত্তের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে এখানে, কেননা প্রেমপাত্রের সমাদর নারীর একান্ত কামনার বস্তু, আবার সেই প্রেমপাত্রের অনাদর অবজ্ঞা অপমান তার জন্য যেন বিষের চাইতেও বেশি।—এমন আরো অনেক চমৎকার মুহূর্তের বর্ণনা 'বিরাজ বৌ'-এ আছে।

কিন্তু এতখানি সার্থক শিল্পকৌশল সত্ত্বেও এটি কি উঁচুদরের উপন্যাস হতে পেরেছে? আমাদের ধারণা—পারেনি; বিরাজের লঘু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এতে যে করা হয়েছে শুধু সেই জন্যই নয়, এর বিষয়টি মোটের উপর সাধারণ—মানুষের মর্মকে গভীর ভাবে স্পর্শ করতে পারে এমন কিছুই তাতে লক্ষণীয় হয়নি। বিরাজের সাধ্বীত্ব, নীলাম্বরের সরলতা ও স্নেহময় প্রকৃতি, পীতাম্বরের সন্দেহপ্রবণতা, মোহিনীর মিতভাষ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, সবই আঁকা হয়েছে চিত্তাকর্ষক করে,' একালের বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চরিত্রগুলো ও কাহিনীটি হয়তো বেশি চিত্তাকর্ষক তাদের বিশেষ বাঙালী ধরন-ধারন, বিশেষ সংস্কারের আবেদন, এইসবের গুণে। কিন্তু সেইপ্রাদেশিকতাই এর উচ্চ মর্যাদার অন্তরায় হয়েছে। শিল্পে চাই বিশিষ্টকে নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পে সেই বিশিষ্ট একই সঙ্গে হয়ে ওঠে প্রাদেশিক ও সার্বভৌমিক। 'বিরাজ-বৌ'-এর চরিত্রগুলো চমৎকার ভাবে প্রাদেশিক, কিন্তু সেই অনুপাতে সার্বভৌমিক কম। 'শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে'র অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-দম্পতির, বিশেষ করে ব্রাহ্মণীর, সঙ্গে তুলনা করলেও বিরাজ-বৌ চরিত্রটির প্রাদেশিকতার ত্রুটি স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই ব্রাহ্মণীও বাংলা দেশের এক কোণের এক অবজ্ঞাত মেয়ে, কিন্তু তার অপূর্ব মানবিকতার গুণে সে একই সঙ্গে প্রাদেশিক ও সার্বভৌমিক হয়ে উঠেছে।

বিন্দুর ছেলে

'বিন্দুর ছেলে'কে সাধারণত বলা হয় বড় গল্প। কিন্তু আসলে এটি ছোট উপন্যাস। গল্পের, অর্থাৎ ছোট গল্পের, গঠন ও আবেদনের বিশিষ্টতা এতে নেই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই। যাদব মুখুয্যে ও

মাধব মুখুয্যে দুই বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু যাদব তার সামান্য আয় দিয়েও মাধবকে ছেলেবেলা থেকে যত্নে মানুষ করে। ক্রমে মাধব উকিল হলো ও দু'পয়সা উপার্জন করতে লাগলো। যাদবই চেষ্টা করে' এক ধনী জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিলে। দুই ভায়ের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এতখানি ছিল যে তারা ভুলে গিয়েছিল তারা সহোদর ভিন্ন আর কিছু, দশ জনেও সে কথা ভুলে গিয়েছিল। বড় বৌ অন্নপূর্ণা ছিল দরিদ্রের কন্যা, কিন্তু যেমন সুগৃহিণী তেমনি স্নেহবতী। ছোট বৌ বিন্দু-বাসিনীর, ওরফে বিন্দুর, রূপ দেখে সবাই খুব খুশী হলো; রূপের সঙ্গে সে প্রচুর অলঙ্কার ও অর্থও নিয়ে এলো; কিন্তু সেই সঙ্গে আনলো প্রচুরতর অহংকার আর অভিমান। তার ফিটের ব্যামো ছিল, সহজেই মূর্ছা হতো। তার মেজাজ যে কখন খারাপ হবে সেই ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত থাকতো। কেবল তার ভাসুর তার সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করতো না; সে বলতো, "মায়ের আমার অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ। সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হতেই পারে না।"

বিন্দুর বয়স যখন বছর পনেরো তখন তার একদিন ফিটের উপক্রম দেখে অন্নপূর্ণা তার দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যকে তার কোলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। ছেলে কেঁদে উঠলো, বিন্দু প্রাণপণ বলে নিজেকে মূর্ছার কবল থেকে রক্ষা করে' ছেলে বুকে করে ঘরে চলে গেল। সেই থেকে বিন্দুর ফিটের এক ওষুধ পাওয়া গেল—অমূল্যকে মানুষ করবার ভার তার উপরে পড়লো। অমূল্য বড় হয়ে খুড়ীকে মা আর মাকে দিদি বলতে লাগলো।

অল্পেই অস্থির হওয়া, বাড়াবাড়ি করা, এই ছিল বিন্দুর স্বভাব। অমূল্যকে মানুষ করা নিয়ে সে খুব ব্যস্ত হলো আর তাতে অন্নপূর্ণার গড়িমসি-পনা লক্ষ্য করে' অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলো। অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠতে লাগলো যখন তাদের

নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাদের পিস্‌তুতো ননদ এলোকেশী তার বছর যোল বয়সের ছেলে নরেনকে নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য বাস করতে এলো। নরেন পড়ে ফোর্থ ক্লাসে, "মাস্টাররা হিংসা করে' তাকে বছরের পর বছর একটা ক্লাসেই ফেলে রেখেছে।" সে ভাল "এ্যাক্টো" করতে পারে আর "তার টেরিটা একটা দেখবার মত জিনিস।" এমন বয়ে-যাওয়া ছেলের সঙ্গ অমূল্যর জন্য কি ভয়ানক যে হবে বিন্দু তা ভেবে কূলকিনারা পেলে না। অন্নপূর্ণাকে সে বললে,—"দিদি ওদের বিদায় করে দাও।" অন্নপূর্ণা বললে, সে প্রস্তাব কর্তার কাছে করলে তিনি তার মুখ দেখবেন না।

ক্রমে অমূল্যর দুষ্টুমি নষ্টামি প্রকাশ পেতে লাগলো। বিন্দুরও মেজাজ চড়তে লাগলো। বড় জা-র সঙ্গে তার কথাবার্তা এক রকম বন্ধ হলো। একদিন বিন্দু অমূল্যর জামার পকেটে সিগারেটের টুক্‌রো পেলো। কিন্তু যেদিন সে শুনলো অমূল্য নরেন ও স্কুলের আরো কয়েকটি বখাটে ছেলের সঙ্গে মিশে এক উড়ে মালীর বাগানে ঢুকে তার অসময়ের আম পেড়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, মালীকে মারধর করেছে, সে জন্য হেডমাস্টার তাদের ফাইন করেছেন, সে ফাইনের টাকা অমূল্য দিয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে, সেদিন তার ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। কথায় কথায় নানাভাবে তীব্র ভৎর্সনা সে অন্নপূর্ণাকে করলো, শেষে বলে বসলো—"...কার পয়সা খরচ কর সেটা দেখতে পাওনা? কার রোজগারে খাচ্চ পরচ সেটা জান না?"

বলেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অঘটন যা ঘটবার তা ঘটলো, অন্নপুর্ণা কেঁদে স্বামীকে সবকথা বল্লো আর শপথ করলো—"ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে বেটার মাথা খেতে হয়।"

বিন্দুদের নতুন বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন সবাই গেল কেবল গেল না তার ভাসুর যাদব, তার জা অন্নপূর্ণা, আর অমূল্য। যাদব নতুন করে' আরম্ভ করলো প্রায় পাঁচ মাইল দূরে জমিদারের কাছারীতে তার বারো টাকা মাইনের চাকরি।

ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো দেখে বিন্দুর লজ্জার আর দুঃখের অবধি রইলো না—সে তার ভাসুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতো, জা-কেও খুব ভালবাসতো। যা তার স্বভাব নয় এমন কাজও সে করলো—স্বামীর পায়ে ধরে' বললে, "ওগো একটি উপায় করে দাও।" স্বামী বললে—"বৌঠানের কাছে যাও। ···আমার পা ধরে সমস্ত দিন বসে থাকলেও উপায় হবে না।"

পীড়িত পিতাকে দেখতে বিন্দু বাপের বাড়ী গেল। সেখান থেকে মাধবের কাছে সংবাদ এলো বিন্দুর শক্ত ব্যামো। মাধব গিয়ে দেখলো বিন্দু মৃত্যু-শয্যায়, ওষুধ পথ্য সব বন্ধ করেছে।

মাধবের মুখে এই সংবাদ শুনে অন্নপূর্ণা কেঁদে উঠলো। যাদব পাগলের মতো হলো, বললে—"এমন হয় না মাধু,···আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে কাউকে দুঃখ দিই নি, ভগবান আমাকে এ বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না।"

তারা সবাই গিয়ে বিন্দুর বাপের বাড়ীতে উপস্থিত হলো। যাদব অশ্রুরোধ করে' বললে—"বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেছি।···যখন এসেছি তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয় আর ওমুখো হব না; জান ত মা, আমি মিথ্যা কথা বলি নে।"

যাদব বাইরে গেলে বিন্দু অন্নপূর্ণাকে বললে, "দাও দিদি কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম করগে। আর ভয় নেই—আমি মরব না।"

'বিন্দুর ছেলে' বেরুলেই খুব নাম হয়েছিল। বিন্দুর কিছু-অস্বাভাবিক চরিত্রের নিপুণ চিত্রণ ছিল এর এমন খ্যাতির মূলে,

এই মনে হয়। একালে কিন্তু বিন্দুর চরিত্র আমাদের খুব খুশী করতে পারে না, তার কারণ, তাতে ভাবালুতার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। তার মনে স্নেহ যথেষ্ট, তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ, কিন্তু সে সব তেমন সার্থক হতে পারেনি তার খেয়ালী আদুরে প্রকৃতির মধ্যে। সাহিত্যের কোনো কোনো বোদ্ধার মতে নিপুণ চিত্রণই রস-সাহিত্যের বড় ব্যাপার। কিন্তু তা সত্য নয়। যা চিত্রিত হলো তার গৌরব যদি তেমন না থাকে তবে শুধু চিত্রণের বাহাদুরি মানুষের মনকে বেশিদিন ভুলিয়ে রাখতে পারে না। 'বিন্দুর ছেলে'তে সব চরিত্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—চরিত্রগুলো অবশ্য মোটের উপর স্বল্পপ্রাণ—প্রাদেশিক বেশি ; বোধ হয় একমাত্র যাদব এতে কিছু মহাপ্রাণ বা স্মরণীয় চরিত্র। তার পরিকল্পনায়ও ভাবালুতা প্রচুর, কিন্তু সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও একটি নম্র নির্বিরোধ স্নেহে ভরা সাধু-আত্মার পরিচয় আমরা তার মধ্যে পাই। উপন্যাসে মন্দ চরিত্র, অদ্ভুত চরিত্র, দোষে-গুণে-মেশা চরিত্র ফুটিয়ে তোলা তত কঠিন নয়, কিন্তু সাধু চরিত্র ফুটিয়ে তোলা বেশ কঠিন কাজ।

প্রাক্-শ্রীকান্ত যুগের অন্যান্য উপন্যাসের মতো 'বিন্দুর ছেলে'তেও প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারের ভাল দিকটা শরৎচন্দ্রের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর সেই শ্রদ্ধা তেমন সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে মনে হয় না। বোধ হয় তার কারণ, জীবনে যা গভীর ভাবে সত্য নয় সাহিত্যে তাকে সত্যকার মর্যাদা দেওয়া কঠিন।

হৃদয়কে, অর্থাৎ প্রেম-প্রীতিকে শরৎচন্দ্র চিরদিন মানুষের মহামূল্য সম্পদ জ্ঞান করতেন। প্রাক্-শ্রীকান্ত যুগে তাকেই যেন তিনি মানুষের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সম্পদ মনে করেছেন। তাতে প্রাক্-শ্রীকান্ত যুগের বিশিষ্ট 'বাঙালী' চরিত্রগুলোর মধ্যে উষ্ণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা প্রচুর ভাবেই পাই। কিন্তু সেই সব

চরিত্রের কতগুলো বা ক'টি শুধু প্রাদেশিক না হয়ে মহাপ্রাণ বা স্মরণীয়ও হতে পেরেছে ?

পণ্ডিত মশাই

'পণ্ডিত মশাই' প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। কাহিনীটি এই। বড়াল গ্রামের বৃন্দাবন জাতিতে বোষ্টম কিন্তু অবস্থাপন্ন লোক। সে বাংলা লেখাপড়া জানে, প্রতিবেশীদের না জানিয়ে ইংরেজীও কিছু শিখেছে। নিজের চাষ-আবাদ সে দেখে; বাড়ীতে একটি পাঠশালাও করেছে, বিনা বেতনে পাড়ার ছেলেদের পড়ায়, তাদের শ্লেট পেন্সিল এ সব কিনে দেয়, তার বক্তব্য—দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের আগে করতে হবে, তারপরে গভর্ণমেণ্টের কথা ভাবতে হবে। সে ভাবে, তার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মতো মানুষ হয় ত দেশের ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যায়। তার পাঠশালায় একটি শর্ত আছে, প্রত্যহ বাড়ী যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্র প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্তত ছুটি একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। সে হিসাব করে দেখেছে তার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে তাহলে বিশ বছরে সারা বাংলায় একটি লোকও মূর্খ থাকবে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এ দুরাশা; কিন্তু আবার ভাবে ভগবান মুখ তুলে চাইলে এ আশা পূর্ণ হতে কতক্ষণ।

আখ্যায়িকার আরম্ভ-কালে এই আদর্শনিষ্ঠ পণ্ডিতের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। সে বিপত্নীক, সংসারে আছে তার মা আর বছর তিনেক বয়সের ছেলে চরণ। তার মায়ের একান্ত ইচ্ছা সে আবার বিয়ে করে। ছেলেবেলায় কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল—কুসুম ছিল এক দরিদ্র বিধবার মেয়ে কিন্তু দেখতে

সুন্দরী। কুসুমের মায়ের নামে বদনাম রটে, তাতে বৃন্দাবনের পিতা আবার তার বিয়ে দেয়। কুসুমের মাও নাকি রেগে আর একজন বোষ্টমের সঙ্গে কুসুমের কণ্ঠীবদল করায়; কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই সেই লোকটি মারা যায়। তখন কুসুমের বয়স সাত বৎসর। সেই থেকে তার গরীব ভাই কুঞ্জর সংসারে সে আছে, পাঠশালায় সে ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছে, অনেকেই তার সই, তাদের কেউ কেউ বিধবা। কুসুম নিজেকেও বিধবা বলেই জানে, বিধবার মতোই থান কাপড় পরে। আখ্যায়িকার আরম্ভ-কালে কুসুমের বয়স ষোল, বৃন্দাবন তাকে দেখেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তার ইচ্ছা কুসুমকেই সে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। তাদের সমাজে এতে বাধা নেই। তার মা প্রথমে তার বাবার কথা ভেবে আপত্তি করে; পরে সম্মত হয়। কিন্তু কুসুম সম্পূর্ণ অসম্মত। তার সইরা যে বলবে হাড়ি ডোমের মতো কুসুমের নিকে হয়ে গেল, একথা ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়। কুঞ্জর একান্ত ইচ্ছা কুসুম বৃন্দাবনের ঘর করে, কিন্তু কুসুম তাকে আমলই দেয় না। বৃন্দাবন অবশ্য হাল ছাড়ে না।

বছর তিনেক পরে কথায় কথায় কুঞ্জ একদিন বৃন্দাবনদের সবাইকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতেরা কুঞ্জর বাড়ীতে গিয়ে দেখলো কুঞ্জ বাড়ীতে নেই। কুসুম এর কিছুই জানতো না, সে দশদিক অন্ধকার দেখলো। যা হোক বৃন্দাবনের বুদ্ধি বিবেচনায় সে যোগ্যভাবেই অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পারলো। বৃন্দাবন এমন শিক্ষিত এবং ভদ্র এই দেখে তার প্রতি কুসুমের বিরূপতা কমলো। সেই দিন বৃন্দাবনের মা নিজের বালা কুসুমের হাতে পরিয়ে দিয়ে কুসুমকে আশীর্বাদ করলো। কিন্তু কয়েক দিন পরে কুসুম সে বালা ফেরত পাঠিয়ে দিলে। এতে বৃন্দাবন তার দিক থেকে তার মন ফেরালো।

বৃন্দাবনের মা কুঞ্জর বিয়ের ঠিক করছিল, সেই সম্পর্কে বৃন্দাবন

একদিন কুঞ্জদের বাড়ী এলো, তার সঙ্গে ছিল চরণ। চরণকে দেখে তাকে কোলে নিয়ে কুসুমের মধ্যেকার ঘুমোনো মা জেগে উঠলো। বৃন্দাবনকে সে দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে' যেতে বললো; কিন্তু বৃন্দাবন তার কথা রাখলো না, বললো, 'চরণকে খাইয়ে দাও।'

বৃন্দাবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ করে' চরণকে বুকে নিয়ে কুসুমের পূর্বের সব বিরূপতা দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৃন্দাবন বললে, কুসুম নিজে তার মায়ের কাছে যাক,—এ ভিন্ন অন্য পথ নেই। নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে স্বামীর ঘরে উঠবে এতে কুসুম রাজী হতে পারলো না যদিও কুঞ্জর বিয়ের পরে তার দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কুসুম পায়ে হেঁটেই বৃন্দাবনের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু তখন বৃন্দাবনের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কলেরায় তার মা মারা গেছে, চরণও মারা গেছে; পাড়ার ব্রাহ্মণ-ডাক্তার শত অনুনয়-বিনয়েও চরণকে দেখতে আসেনি, কেন না, ডাক্তারবাবুর মামা তারিণী মুখুয্যের বাড়ীর কলেরার কাপড়-চোপড় বৃন্দাবন তার পুকুরে ধুতে নিষেধ করেছিল।

চরণের মৃত্যুতে বৃন্দাবনের চোখে সংসার শূন্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভগবানের মঙ্গলময়তায় আস্থা সে ফিরে পেলো—সে দেখলো চরণ বেঁচে থাকতে শুধু চরণের কথাই সে ভাবতো, কিন্তু চরণের মৃত্যুতে সে সকল শিশুর মুখেই চরণের মুখ দেখলো। সেই শিশু-দের কল্যাণসাধন সে তার জীবনের ব্রত করলো—গ্রামে ভাল নলকূপের ব্যবস্থা করতে ও তার স্কুলের ব্যয় নির্বাহ করতে সে তার সম্পত্তি দান করে' গ্রাম ত্যাগ করলো। কুসুম তার সঙ্গ ছাড়লো না। বললে, "অবহেলায় ছেলে হারিয়েছি, স্বামীকে হারাতে আর পারবো না।"

গল্প হিসাবে 'পণ্ডিত মশাই' খুব সাধারণ; কুসুমের মনের দ্বন্দ্ব

মোটের উপরে বিশেষত্ব-বর্জিত। চরিত্রগুলো সুস্পষ্ট, কিন্তু সাহিত্যিক বৈভবে অনেকখানি দীন। বৃন্দাবনের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। এমনি সব কারণে উপন্যাস হিসাবে এটিকে বিশেষ মূল্য দেওয়া কঠিন। কিন্তু এতে লক্ষণীয় দুইটি ব্যাপার আছে, একটি, পল্লীর উন্নতি, বিশেষ করে' শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণা, অপরটি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের হৃদয়হীনতা ও অধোগতির এক শ্বাসরোধকর চিত্র।

শিক্ষা সম্বন্ধে বৃন্দাবনরূপী শরৎচন্দ্রের কিছু বক্তব্য আমরা জেনেছি ; তাঁর আর একটি বক্তব্য এই : পল্লীতে যাঁরা শিক্ষা বিস্তার করতে যাবেন তাঁদের পল্লীর অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের ভিতরে আসন নিতে হবে, পল্লীর চিরাচরিত আচার, যেমন জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্য, আচরণীয়-অনাচরণীয়, এসব সম্বন্ধে তাদের সংস্কার, তাঁদের মান্য করতে হবে, নইলে পল্লীর লোকদের হৃদয় তাঁরা জয় করতে পারবেন না, কাজও তাঁদের এগোবে না। 'পল্লীসমাজে' এসব কথা শরৎচন্দ্র আরো বিস্তৃত করে' বলেছেন। আমরা জানি শরৎচন্দ্রের কাছে বিশেষ মূল্য অভিজ্ঞতার। এসব যে তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ কথা তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কাল বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলায়। এক সময়ে যারা অত্যন্ত অনড় মনোভাবের পরিচয় দেয়, অন্য সময়ে তারাই হয় যথেষ্ট সচল। মনে হয় শরৎচন্দ্রের এইসব নির্দেশের মধ্যে একটি খুব কাজের কথা বাদ পড়ে গেছে ; সেটি এই : কর্মীকে নিরহঙ্কার প্রীতিময় লোকচরিত্রজ্ঞ এসব তো হতে হবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সর্বোপরি তাকে হতে হবে অকপট ; নইলে কাজ তার দ্বারা হয়তো ঢের হবে, কিন্তু আসলে সেসব অকাজ। অকপট কর্মী প্রথমে ব্যর্থ হতেও পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাফল্য তারই লাভ হয়। এর প্রমাণ শরৎচন্দ্র নিজে। তাঁর অকপট বাণীর প্রথমে লাভ হয়েছিল তীব্র ভর্ৎসনা, কিন্তু পরে সে-দুর্দিন সম্পূর্ণ কেটে যায়।

ব্রাহ্মণদের প্রতিশোধ নেওয়ার যে চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, তা যেমন নির্বোধ তেমনি ভয়াবহ। এমন ঘটনা অহরহ অবশ্য ঘটে না, কিন্তু এ যে অতিরঞ্জন নয় তাও স্বীকার করতে হবে, আর সেই জন্যই ভাবতে হয় কি কারণে এতবড় অধোগতি মানুষের হয়। শরৎচন্দ্র সে দিকটায় তেমন মন দেননি, তিনি দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন এই অমানুষিক চিত্র। শিল্পী হিসাবে তাতেই তাঁর কর্তব্য অবশ্য সুসম্পন্ন হয়েছে, কেন না, প্রায় মূক থেকেও আমাদের হৃদয়-মনকে তিনি করেছেন মুখর। এমন চিত্রকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বললে ভুল করা হয়। এ এক ঘোর ট্র্যাজিডির রূপায়ণ—এখানে শুধু অসহায় শিশু চরণের মৃত্যুই আমরা দেখছি না, তার হন্তারকদের শোচনীয় ধ্বংস-রূপও আমরা দেখছি।

বৃন্দাবনকে যে অনেকখানি আদর্শনিষ্ঠ করে' শরৎচন্দ্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন তা আমরা দেখেছি। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ভাল কথাই তার মুখে আমরা শুনি, শিক্ষকরূপে তার আদর্শনিষ্ঠার ছবি তেমন পাই না—পাই বরং কুসুমকে স্ত্রীরূপে পাবার তার ঐকান্তিক কামনার চিত্র। ভগবানের মঙ্গল-বিধানে তার আস্থার ছবিও তেমন ফোটেনি ; চরণের মৃত্যুর পরে তার যে মূর্তি দেখি তা শোক-বিহ্বল পিতার মূর্তি—সমর্পিতচিত্ত জ্ঞানী বা ভক্তের মূর্তি নয়। তার মুখে শরৎচন্দ্র এই যে কথাটি বসিয়েছেন : "আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষালাভ হল, তত বড় শিক্ষা, পুত্রশোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না," এটি সত্যকার জ্ঞানের কথা তেমন নয়, এর প্রেরণা শ্মশান-বৈরাগ্য থেকে।

এক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পরিবেশে এক শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমানীদের অবিশ্বাস্যরকমের মূঢ়তা ও হৃদয়হীনতা সহসা এক প্রলয়কাণ্ড ঘটালো —এই অস্বস্তিকর করুণ ছাপটি যে আমাদের মনের উপরে পড়ে এইটিই 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসখানিতে বিশেষ স্মরণীয় সম্পদ।

পল্লী-সমাজ

'পল্লী-সমাজ' প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এটি শরৎচন্দ্রের খুব একখানি জনপ্রিয় বই। প্রাক্-শ্রীকান্ত যুগের উপন্যাস গুলোর মধ্যে সব চাইতে নাম করা 'চরিত্রহীন।' কিন্তু রচনা হিসাবে সেই যুগের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'পল্লী-সমাজ'ই বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

এত জনপ্রিয় বইয়ের কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে হয় না। এতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তিন অংশে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে। প্রথম, রমেশ ও রমার প্রেম; দ্বিতীয়, পল্লীর সমস্যার জটিলতা আর তার সমাধানের পথে বাধা; তৃতীয়, বাধার তিরোধান। রমা ও রমেশের প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতির কথা লেখক সংক্ষেপে বলেছেন, কেন না, যে-পল্লী-সমাজের চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে সেই প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আদৌ নেই। তাদের দুইজনের মধ্যে ছেলেবেলায় যে ছেলেমানুষী ভালবাসা ছিল রমেশ তা বিস্মৃত হয়নি, কিন্তু রমা বিস্মৃত হয়েছিল। বহুদিন পরে বিধবা রমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন রমেশ তাকে তার ছেলেবেলার নাম ধরে ডাকলো, তাতে সেই ভুলে যাওয়া স্মৃতি যেন নতুন প্রাণ পেলো রমার মধ্যে। কিন্তু পল্লী-সমাজের সঙ্গে রমা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, তাই পল্লী-সমাজের অন্যতমা নেত্রীরূপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে পল্লীর সংস্কার-প্রয়াসী রমেশের বিপক্ষে দাঁড়াতে হলো। তার মন ও আচরণের বিরোধ চরমে পৌঁছলো যেদিন সে দুর্নামের ভয়ে রমেশের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, আর তার ফলে রমেশের ছয় মাসের জেল হলো। নিজের এই অপরাধ তার মনে গভীর করেই বাজলো। শেষ পর্যন্ত রমেশের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে দেখে সে কিছু শান্তি লাভ করলো। রমেশের উপরে তার

ছোট ভাই যতীনের মানুষ করার ভার দিয়ে ভাঙা মন ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ করে সে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশীবাস করতে চললো। রমার প্রতি রমেশের প্রেম ছিল প্রথম থেকেই গভীর, কিন্তু শান্ত। রমার অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত শত্রুতায় সে খুব দুঃখ পেলো, সময় সময় দিশাহারাও হলো, কিন্তু সে প্রেম কখনও মন থেকে মুছে গেল না। শেষ পর্যন্ত সে রমার অবস্থার কথা বুঝলো ও তাদের দুরতিক্রম্য নিয়তিকে দুঃখের সঙ্গে মেনে নিলো। রমা ও রমেশের প্রেম মুখ্যত প্রেমের নীরব আত্মনিবেদন, ভোগাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত। রমেশ নানাভাবে নিপীড়িত হয়েও সে-প্রেমের অমর্যাদা করেনি। কিন্তু পল্লীর প্রধানদের চাপে পড়ে রমা রমেশের প্রতি তার প্রেমের অমর্যাদা করতে বাধ্য হলো—তাতে জীবন তার জন্য হলো দুর্বহ। শেষের দিকে তার অত কান্না দেখে কোনো কোনো সমালোচক বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই কান্নার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার চরিত্র। বাইরে সে প্রতাপান্বিতা জমিদার-কন্যা, কিন্তু অন্তরে সে মার্জিত-রুচি স্নেহময়ী নারী ভিন্ন আর কিছু নয় ; তার নিষ্পাপ প্রেমাস্পদ তারই দুর্বলতায় অমন কঠোর শাস্তি ভোগ করলো—এ দুঃখের সান্ত্বনা তার নেই।

কিন্তু এ বইতে রমা ও রমেশের বেদনা-মধুর প্রেম কাহিনীর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পল্লী-সমাজের বিচিত্র চরিত্র ও সমস্যার উপরে শরৎচন্দ্রের অলোকপাত আর সেই সব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ। পল্লী-সমাজে যে বিকৃতি ঘটেছে তার রূপ রমেশরূপী শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েছে এই ভাবে ঃ

> দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি স্বচ্ছন্দতা আজও আছে যাহা বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে

আর একজনে বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায় শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায়রে একি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! নগরের সজীব চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে তখনই সে মনে করিয়াছে, কোন মতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মতো রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র! কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্ম্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃত দেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্যসমাজ যে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারি বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে।......

চরিত্র ও জীবন্ত ধর্ম গ্রাম থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, পড়ে আছে শুধু তার মৃতদেহ; সেই 'বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকে' যথার্থ ধর্ম জ্ঞান করে' হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' তার বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় 'কেমন করে' অধঃপথে নেমে গেছে, তার এক অবিস্মরণীয় চিত্র শরৎচন্দ্র যে উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন তাঁর 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাস খানিতে এতে তাঁর এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ হয়েছে। যাঁরা বলেন সাহিত্য প্রোপাগাণ্ডা নয় তাঁরা অর্ধসত্য উচ্চারণ করেন মাত্র। সাহিত্য একই সঙ্গে প্রোপাগাণ্ডা এবং তার অতিরিক্ত আরো কিছু। অল্প

ছোট ভাই যতীনের মানুষ করার ভার দিয়ে ভাঙা মন ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ করে সে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশীবাস করতে চললো। রমার প্রতি রমেশের প্রেম ছিল প্রথম থেকেই গভীর, কিন্তু শান্ত। রমার অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত শত্রুতায় সে খুব দুঃখ পেলো, সময় সময় দিশাহারাও হলো, কিন্তু সে প্রেম কখনও মন থেকে মুছে গেল না। শেষ পর্যন্ত সে রমার অবস্থার কথা বুঝলো ও তাদের দুরতিক্রম্য নিয়তিকে দুঃখের সঙ্গে মেনে নিলো। রমা ও রমেশের প্রেম মুখ্যত প্রেমের নীরব আত্মনিবেদন, ভোগাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত। রমেশ নানাভাবে নিপীড়িত হয়েও সে-প্রেমের অমর্যাদা করেনি। কিন্তু পল্লীর প্রধানদের চাপে পড়ে রমা রমেশের প্রতি তার প্রেমের অমর্যাদা করতে বাধ্য হলো—তাতে জীবন তার জন্য হলো দুর্বহ। শেষের দিকে তার অত কান্না দেখে কোনো কোনো সমালোচক বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই কান্নার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার চরিত্র। বাইরে সে প্রতাপান্বিতা জমিদার-কন্যা, কিন্তু অন্তরে সে মার্জিত-রুচি স্নেহময়ী নারী ভিন্ন আর কিছু নয়; তার নিষ্পাপ প্রেমাস্পদ তারই দুর্বলতায় অমন কঠোর শাস্তি ভোগ করলো—এ দুঃখের সান্ত্বনা তার নেই।

কিন্তু এ বইতে রমা ও রমেশের বেদনা-মধুর প্রেম কাহিনীর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পল্লী-সমাজের বিচিত্র চরিত্র ও সমস্যার উপরে শরৎচন্দ্রের অলোকপাত আর সেই সব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ। পল্লী-সমাজে যে বিকৃতি ঘটেছে তার রূপ রমেশরূপী শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েছে এই ভাবে :

> দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি স্বচ্ছন্দতা আজও আছে যাহা বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে

আর একজনে বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায় শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায়রে একি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! নগরের সজীব চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে তখনই সে মনে করিয়াছে, কোন মতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মতো রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র! কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্ম্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃত দেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্যসমাজ যে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারি বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে।......

চরিত্র ও জীবন্ত ধর্ম গ্রাম থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, পড়ে আছে শুধু তার মৃতদেহ; সেই 'বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকে' যথার্থ ধর্ম জ্ঞান করে' হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' তার বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় 'কেমন করে' অধঃপথে নেমে গেছে, তার এক অবিস্মরণীয় চিত্র শরৎচন্দ্র যে উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন তাঁর 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাস খানিতে এতে তাঁর এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ হয়েছে। যাঁরা বলেন সাহিত্য প্রোপাগাণ্ডা নয় তাঁরা অর্ধসত্য উচ্চারণ করেন মাত্র। সাহিত্য একই সঙ্গে প্রোপাগাণ্ডা এবং তার অতিরিক্ত আরো কিছু। অল্প

কথায় বলা যায়, সেই অতিরিক্ত আরো কিছু হচ্ছে লেখকের চিন্তা ভাবনা বা জীবন-দর্শন আর তাঁর চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা। এই তিনের যোগ সুন্দর হলে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্ম হয় একথা বলা যায়, অন্তত বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে এই তিনের সুন্দর যোগ আমরা দেখতে পাই। 'পল্লী-সমাজে' এই তিনের যোগ কেমন হয়েছে দেখতে চেষ্টা করা যাক।

পল্লী-সমাজ থেকে চরিত্র ও জীবন্ত-ধর্ম যে অন্তর্হিত হয়েছে তার এক অতিশয় চোখে পড়বার মতো ছবি শরৎচন্দ্র আঁকতে পেরেছেন। বেণী গোবিন্দ ধর্মদাস পরান এরা সব মূর্তিমান অধর্ম, যা কিছু সঙ্গত শোভন দেশের হিতকর তাই এদের চক্ষুশূল, নিজেদের ক্ষুদ্রতম লাভের জন্য, এমন কি শুধু পরের ক্ষতি করার জন্য, এরা অন্যায়-অধর্মের পথে অগ্রসর হয়। এদের শয়তানি অবিশ্বাস্য-রকমে উৎকট। শুধু এক বিষয়ে এরা বড় খাটো—এরা অত্যন্ত ভীরু, সেই ভীরুতা না থাকলে এরা অ-মানুষ হতো। এই ভীরুতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তাতে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে, জ্যাঠাইমার মুখে তিনি বলেছেন ঃ

> ....যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশী থাকে, তাহলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।

এই চিন্তা থেকে অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্বন্ধে যে একটি বিশেষ মনোভাবের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে হয় তার পরিচয় আমরা পরে পাব।

বেণী গোবিন্দ ধর্মদাস পরান এরা যেমন পল্লী-সমাজের অধর্মের মূর্তি তেমনি তার দুর্বলতা ও অসহায়তার মূর্তি আমরা দেখি ভৈরব আচার্য আর দীনু ভট্টাচার্য্যের মধ্যে। বেণী-আদির ভয়ে ভৈরব তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে—তার পরিত্রাতা রমেশের প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিলে। দীনু ভট্টাচার্যও এদের

ভয়ে ভীত; কিন্তু তার গোপন আত্মাটি 'অজেয় রয়েছে—সে বড় গরীব, এক রকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই দিন চালায়, একথা সে সহজ ভাবেই কবুল করে, আর রমেশকে নিরিবিলি পেয়ে বলে, 'আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের দয়া-ধর্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না ক'রে আর ছেড়ে দেয় না।" দীনু ভটচার্জি একটি ছোট্ট চরিত্র, কিন্তু বড় সুন্দর করে' আঁকা—দারিদ্র্য ও দুর্বুদ্ধি-লাঞ্ছিত পল্লী-জীবনের সে যেন এক গোপন কান্না। আরো কয়েকটি ছোট চরিত্র এতে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেমন, বাঁড়ুয্যে মশায়, মুদি মধুপাল, গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার বনমালী পাড়ুই, ক্ষ্যেন্তি বামনি, আর বিশেষ করে' আকবর সর্দার। এরা প্রত্যেকে তাদের স্বল্প পরিসরে প্রাণবন্ত, সেই সঙ্গে পল্লীজীবনের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত এদের মধ্যে। এমন সব ছোট চরিত্র সম্বন্ধে বলা যায়—

No perfect thing is too small for eternal recollection.

পূর্ণাঙ্গ যা তা যত ক্ষুদ্রই হোক চিরস্মরণের অযোগ্য তা নয়।

এই দুর্ভাগ্য পল্লী-সমাজের মধ্যে চরিত্র ও ধর্মের প্রতিমূর্তি হচ্ছে জ্যাঠাই-মা। রমার মধ্যেও ধর্ম রয়েছে, কিন্তু পরিবেশের দ্বারা তা আচ্ছন্ন। জ্যাঠাই-মা-র উপর 'গোরা'র আনন্দময়ীর প্রভাব স্পষ্ট, গোরাতে পল্লী-জীবন সম্বন্ধে যে সব কথা আছে তা থেকে শরৎচন্দ্র প্রেরণা পেয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজস্বতাও পল্লী-সমাজে রূপ পেয়েছে। জ্যাঠাই-মা আনন্দময়ীর অনুকৃতি হন নি; তাঁর জগৎ আনন্দময়ীর জগৎ থেকে ভিন্ন, তাই তিনিও কিছু ভিন্ন হয়ে উঠেছেন। আমাদের কোনো কোনো খ্যাতনামা সমালোচক আনন্দময়ী, জ্যাঠাই-মা, এসব চরিত্রকে ভাবের পুতুল ভেবেছেন, তাঁদের চোখে এরা জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সেটি তাঁদের

দেখার ভুল। সাধু চরিত্র আঁকতে গিয়ে অনেকেই ভাবের পুতুল বা বিরক্তিকর বক্তা দাঁড় করান তা মিথ্যা নয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠত্বের এক প্রমাণ এই যে তাঁরা সাধু চরিত্র প্রাণবন্ত করতে পারেন। আনন্দময়ীও অপূর্ব্বভাবে প্রাণবন্ত। তিনি একই সঙ্গে মহিম, গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতার মা আর সর্বজাতির সর্বদেশের মা। পল্লী-সমাজের জ্যাঠাই-মা এত বড় মা হয়ে উঠেন নি। তিনি বেণী রমেশ রমা আর কুঁয়াপুর গ্রামের মা যেমন একান্তভাবে তেমন একান্তভাবে সর্বদেশের সর্বজাতির মা নন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অব্যাপক পরিসরে তিনিও প্রাণবন্ত ও সক্রিয় ; তাঁর আপন ছেলে বেণীকে এতখানি ধর্মহীন দেখে তাঁর বেদনার অন্ত নেই, সেই বেদনাই রূপ পেয়েছে রমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর এই উক্তিতে ঃ

> (বেণীর) মাথার ঘা সারতে বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ী আসতে পারবে।...... এতে তার ভালই হবে......ভাবচ মা হয়ে সন্তানের এতবড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কেমন করে বলচি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা পেয়েছি কি আনন্দ পেয়েচি তা বলতে পারি নে।......কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

একজন সাধারণ মা একথা কিছুতেই বলতে পারতেন না ; কিন্তু জ্যাঠাইমার মধ্যে যে শুধু মায়ের বেদনা নয়, ধর্মেরও সুগভীর বেদনা।

জ্যাঠাইমার মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ব্যক্ত করেছেন। পণ্ডিত মশাই-তে সে-দর্শনের সঙ্গে আমরা কিছু পরিচিত হয়েছি। 'পল্লী-সমাজে' তাঁর বক্তব্য আরো খানিকটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে। অবশ্য দেশের জীবনের পূনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁর আসল মত কি সেটি কিছুটা জটিল, তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' ও

'বিপ্রদাসে'র আলোচনা কালে তা আমরা দেখবো। 'পল্লী-সমাজে' তাঁর বক্তব্য মোটের উপর এই: জাতিভেদ ছোঁয়াছুঁয়ি এসবের ফলে হিন্দু-সমাজের দুর্দশা দেখা দিয়েছে কিনা এ সব প্রশ্ন অগ্রগণ্য নয়, অগ্রগণ্য প্রশ্ন হচ্ছে পল্লীর সাধারণ লোকেদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালা, তাদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, তাদের অভীত করা।—জাতিভেদ ছোঁয়াছুঁয়ি এদের বিরুদ্ধে অভিযান উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে চলেছিল, তাতে সুফল যা লাভ হয় তার সঙ্গে একটি কুফলও লাভ হয়—হিন্দুসমাজে সনাতনী আর সংস্কার-পন্থীদের তীব্র রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি দেখা দেয়। এর পর অনেক চিন্তাশীল মনোযোগ দিলেন জাতিভেদ-আদি দূর করবার দিকে নয়, শিক্ষার বিস্তার ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াবার দিকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী-আন্দোলনের দিনে নেতারা ও কর্মীরা জোর দিলেন পারস্পরিক সহযোগিতা আর আত্মনির্ভরতার ব্যাপক চর্চার উপরে--সঙ্গে সঙ্গে অভীত হবার মন্ত্রও দেশের লোকদের তাঁরা দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশের লোকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো অস্পৃশ্যতা দূর করা আর সমস্ত ভারত ব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতা আর বিশেষ ভাবে অভয়ের সাধনের দিকে। 'পল্লী-সমাজ' বের হয় অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে, কাজেই স্বদেশী আন্দোলনই শরৎচন্দ্রকে প্রেরণা যুগিয়েছিল মনে হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি কাল বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোভাবও বদলায়। কালে কালে ছোঁয়াছুঁয়ি অবজ্ঞাত তো হয়েছেই, জাতিভেদের প্রতাপও শিথিল হয়েছে—সনাতন পন্থীদের মধ্যে। শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন আজ আমাদের হ'তে হয়েছে—শরৎচন্দ্র যা আদৌ ভাবেন নি। কাজেই শরৎচন্দ্রের পল্লী-সংগঠনের কার্যক্রম আজ সহজেই অপূর্ণাঙ্গ বিবেচিত হবে। তবে তিনি জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধতা ও অভয় সাধনের উপরে যে জোর দিয়েছিলেন তার মর্যাদা আজো অম্লান।

মানুষের, বিশেষ করে' অত্যাচারিতদের, সত্যকার প্রেমিক তিনি, তাই তাদের উদ্ধারের এই বড় উপায়টির মর্যাদা সহজেই তিনি বুঝেছিলেন।

'পল্লী-সমাজে'র রমেশ শরৎচন্দ্রের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সমস্ত বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় চরিত্র। সে বয়সে তরুণ, সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; মানুষকে সে বিশ্বাস করে অতি সহজে, আর সেই বিশ্বাস ভঙ্গ হলে মনে আঘাতও বেশি পায়, কিন্তু এই অপরিণত তরুণের হৃদয়টি অসাধারণ—সবার জন্য তার অন্তরে প্রেম প্রীতি রয়েছে, প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও কারো চাইতে উচ্চতর আসন সে দাবি করে না, সে আসন কেউ যদি তাকে দিতে চায় তবে সে কুণ্ঠিত হয়। মানুষের নীচাশয়তা ও নষ্টামির পরিমাণ দেখে মাঝে মাঝে সে ধৈর্য হারায়, কিন্তু তার অন্তরের প্রেম-প্রীতি সহজেই তাকে তার প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে ফিরিয়ে আনে। শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ কোনো কোনো বিষয়ে রমেশের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী; কিন্তু ইন্দ্রনাথকে দেখে আমরা বিস্মিত হই,—রমেশকে আমরা ভালবাসি, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাও করি। অপরিণত চরিত্র বিন্দু আমাদের সহানুভূতি কিছু আকর্ষণ করে, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না; কিন্তু অপরিণত রমেশ আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা দুই-ই আকর্ষণ করে, কেন না, সে বিকাশোন্মুখ—উদার আলো-বাতাসের দিকে তার অন্তরাত্মার অভিসার। সাহিত্যিক সৃষ্টির উৎকর্ষ অবকর্ষের বিচার করতে হয় জীবনের দিকে তাকিয়েই—জীবনে যা মহৎ সাহিত্যেও তাই-ই মহৎ।

'পল্লী-সমাজে' শরৎচন্দ্রের বক্তব্যকে আমরা তিন অংশে ভাগ করে দেখতে চেয়েছি। প্রথম অংশ, অর্থাৎ রমা ও রমেশের প্রেম সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, কিন্তু সেই বিবৃতি সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের মর্ম স্পর্শ করে; দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ পল্লী-সমাজের সমস্যার জটিলতা আর তার সমাধানের পথে বাধার বিপুলতা, সেটি তো

অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গেই অঙ্কিত হয়েছে; কিন্তু এর তৃতীয় অংশ অর্থাৎ বাধার তিরোধান ও পল্লীর নবজীবন আরম্ভ, সেটি আমাদের কিছু খুশী করলেও পুরোপুরি খুশী করতে পারে না। কেন না পল্লীর সাধারণ লোকদের একটু মাথা চাড়া দেওয়া ভিন্ন জাগরণের আর কোনো লক্ষণ বা ছবি তাদের মধ্যে তেমন আমরা দেখি না। অবশ্য সাধারণ লোকদের এই মাথা চাড়া দেওয়া তাদের জাগরণের একটি বড় লক্ষণ বলেই মানতে হবে; কিন্তু এই মাথা চাড়া দেওয়াই যে আমাদের দেশের মতো জটিল পরিস্থিতির দেশে পর্যাপ্ত নয়, অসহযোগ আন্দোলনের পরের ইতিহাস থেকে আমরা তা জানি; বিশেষ করে' বেণী যে ভাবে মনের দিক থেকে কিছু মাত্র না বদলে শুধু ভয়ে রমেশের দলে ভিড়লো, আর তাতেই রমেশও খুশী হলো, সেটি আমাদের পল্লী-সংগঠনের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই খুশী হবার মতো ব্যাপার নয়। তবে শরৎচন্দ্রের চিন্তায় এই একটি জটিল বন্ধ আছে—তাঁর চিন্তা অনেক সময় সোজা বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অদ্ভুতভাবে একটা আপোষ করে' বসে। হয়তো তাঁর ধারণা, ঘোর বিরোধিতা যার সঙ্গে চলেছে সেও যদি প্রীতি প্রার্থী হয় তবে তাকে প্রীতিদান করাই ভাল, তাতে কার্য সিদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা। শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে সুনন্দা চরিত্রের আলোচনা কালে এটি আমরা দেখবো।

চিত্রের দিক দিয়ে 'পল্লী-সমাজ' অপূর্ব; কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে কিছু দুর্বলতা তাতে আছে এই আমাদের মনে হয়েছে।

চরিত্রহীন

'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এর পঞ্চম সংস্করণে শরৎচন্দ্র এই ভূমিকাটি যোগ করেন:

> চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্পবয়সে। তারপর ওটা পড়ে ছিল। শেষ করার কথা মনেও ছিলনা, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হল বহু কাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেই গুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।

চরিত্রহীন সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে ঢের। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই ভূমিকাটির দিকে কেউ যে তাকিয়েছেন তা মনে হয় না। এই ভূমিকাটি কিন্তু খুব মূল্যবান, তার কারণ, এতে চরিত্রহীন উপন্যাস খানির এক বিশেষ পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচয়টি এই যে এটি মোটের উপর শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত রচনা।

এর অপরিণতি সহজেই চোখে পড়ে গল্পটির গাঁথুনির দিকে তাকালে। কাঁচা নাটুকে ভঙ্গিও এতে প্রচুর।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এটি যখন প্রথম 'যমুনা' মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে প্রায় তখন থেকেই পাঠকদের মনোযোগ এর দিকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অর্থাৎ বঙ্কিমোত্তর বাংলা উপন্যাসে, দুইখানি বই প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য হয়েছে—একখানি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' অপর খানি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'। চরিত্রহীনের অপরিণতি, আর অসাধারণ প্রভাব, দুয়েরই কথা আমাদের ভাবতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, চরিত্রহীন তিনজন চরিত্রহীন আর একজন চরিত্রবানের কাহিনী ; সেই তিনজন চরিত্রহীন হচ্ছে সতীশ সাবিত্রী কিরণময়ী আর চরিত্রবান হচ্ছে উপেন্দ্র। এরা ভিন্ন আরো বহু চরিত্র এই উপন্যাসে আছে, তাদের মধ্যে সতীশের ভৃত্য বেহারী আর উপেন্দ্রের পত্নী সুরবালার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবু চরিত্রহীনকে মোটের উপর সতীশ সাবিত্রী কিরণময়ী আর উপেন্দ্রের কাহিনী বলা যেতে পারে।

গ্রন্থের নায়ক সতীশ মস্ত বড় জমিদারের ছেলে। বয়স বছর তেইশ, সুদর্শন, ব্যায়ামের দ্বারা গঠিত তার সুউন্নত বলিষ্ঠ শরীর সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এণ্ট্রান্স পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি সেজন্য কিছুমাত্র মাথাব্যথাও তার নেই। আখ্যায়িকার সূচনায় সে কলকাতায় এক মেসে থেকে হোমিওপ্যাথিক পড়ছে, উদ্দেশ্য, গ্রামে গিয়ে একটি ভাল দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র ও হাসপাতাল খুলবে। তার সম্বন্ধে তার বন্ধু ও গুরু উপেন্দ্রের একটি মন্তব্য এই :

> রাগ পদার্থটি ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশী, প্রাণের মায়াটিও ঠিক তেমনি পরিমাণে কম। এই কলিযুগে বাস করেও যাদের ন্যায় অন্যায়ের ধারণা সত্যযুগের মতোই থাকে, এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাহিত বোধ থাকে না, তাদের বেঁচে থাকা না থাকার উপর আমি ত বেশী আস্থা রাখিনে। সহ্য করতে পারাও যে একটা ক্ষমতা, অনাহূত সাহায্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও যে অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন সেটা ও বোঝেই না। ও যেন সেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে বাংলা দেশে এসে জন্মেছে।

এ থেকে তার চরিত্রের অনেকখানি পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু সবখানি নয়। এই অসাধারণ অকপটতা নির্ভীকতা আর হৃদয়ের প্রসারের সঙ্গে তাতে রয়েছে এক গভীর প্রেম-প্রীতির ক্ষুধা

—প্রেম-প্রীতি পেয়ে ও দিয়ে সে যেন জীবনের পরম চরিতার্থতা লাভ করে। তার চরিত্রের এই দিকটা চরিত্রহীন-কারের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

গল্পের সূচনায় যে মেসে তাকে আমরা পাই সেখানে চাকরেরা তার একান্ত ভক্ত—তার দরাজ হাতের জন্য, আর বাবুদের কেউ কেউ তার উপর রীতিমতো অসন্তুষ্ট ঐ একই কারণে। মেসের ঝি সাবিত্রীর বয়স বছর বাইশ, বিধবা, কথা-বার্তায় চাল-চলনে ঝি জাতীয় স্ত্রীলোকের মতো আদৌ নয়। সাবিত্রী মেসের সব বাবুরই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে, তারো মধ্যে সতীশ বাবুর কাজ সে যে আরো একটু মন দিয়ে করে, তা সতীশও বোঝে। সতীশও অনেক সময় এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা বুদ্ধিমতী মার্জিত-রুচি ঝির কথা একটু ভাবে ; সে যে ঝি জাতীয় স্ত্রীলোক এ তার প্রত্যয় হয় না, কিন্তু সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেকে ঝি ভিন্ন আর কিছুই বলে না। সতীশ এই বয়সেই সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে। কিন্তু সেই বিদ্যা তার জন্য জুটিয়েছে এমন সব সঙ্গী যারা মদ্যপায়ী, এবং মদ্যপায়ী হলে আরো যে সব দোষ সাধারণত ঘটে সেসব দোষেও দুষ্ট। সতীশ মাঝে মাঝে মত্ত অবস্থায় মেসে ফেরে। কিন্তু সাবিত্রীর প্রভাবে সে মদ্যপান প্রায় ত্যাগ করে। বাসার ঝি হলেও নিজের অজ্ঞাতসারে সতীশ তাকে অনেকখানি সমীহ করে' চলে। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর ব্যবহারেও মাঝে মাঝে এতখানি মাধুর্য প্রকাশ পায় যা সতীশকে অন্তরে অন্তরে বিচলিত না করে পারে না। এমনি ভাবে বিচিত্র ছোটখাটো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সতীশ বুঝতে পারে সে সাবিত্রীকে ভালবাসে। একটা ঝিকে ভালবাসা অতিশয় অসঙ্গত এ চেতনা তাতে দেখা দেয়, কিন্তু মনকে সে বশে আনতে পারে না। সাবিত্রী সতীশকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। তাতে সতীশ ক্রুদ্ধ হয়ে

সাবিত্রীকে বহু অপমানকর কথা বলে। সাবিত্রী সতীশকে স্পষ্টই বলে ঃ

> একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালী মাখিয়ো না।

সতীশকে এড়াবার জন্য সাবিত্রী কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়। সতীশ সাবিত্রীর খোঁজ না করে পারে না। সে সংবাদ পায় সাবিত্রী সতীশের ইয়ার বিপিন বাবুর আশ্রিতা হয়েছে। সংবাদটি অবশ্য ভুল। কিন্তু সতীশ মর্মাহত হয়। শেষে সে মনকে বোঝায়, সাবিত্রী তাকে একদিনের জন্যও ছলনা করেনি। বরং পুনঃ পুনঃ সতর্ক করেছে, শুভ কামনা করেছে।—সাবিত্রীর স্মৃতি শেষ পর্যন্ত তার জন্য হলো এক অমূল্য গোপন সম্পদ ঃ

> ....সাবিত্রীর মুখ উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পতিতার কোন কালিমাই ত সে মুখে নাই! গর্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, স্নেহে স্নিগ্ধ, সেই সংযত পরিহাস, সর্বোপরি তার সেই অকৃত্রিম সেবা। এমন সে তাহার এতখানি বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার আবরণটা লইয়া খেলা করিতে গিয়া যে আগুন বাহির হইয়া পড়িয়াছে ইহার দাহ হইতে কেমন করিয়া কোন পথে পলাইয়া আজ সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে! নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই বা কি হইবে? তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অশ্রু সে দমন করিতে চাহিল না—এ অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না। অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ সে তাহার পরম দুঃখের মধ্যে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত বড় সুখের আস্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল তাহারই উদ্দেশে দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল।

……চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে মনে বলিল· ·ভগবান! কার হাত দিয়ে তুমি কখন যে কাকে কি পাঠিয়ে দাও, কেউ বলতে পারে না। আজ তোমারি হুকুমে সাবিত্রী দাতা আমি ভিক্ষুক। তাই সে ভাল হোক, মন্দ হোক, সে বিচার আর যে-ই করুক আমি যেন না করি। আমার বুক থেকে সব জ্বালা সব বিদ্বেষ মুছে দাও—তার বিরুদ্ধে আমি যেন কৃতঘ্ন না হয়ে থাকি।

এরপর সতীশের পরিচয় হয় ব্যারিষ্টার জ্যোতিষ রায় ও তার অনূঢ়া ভগিনী সরোজিনীর সঙ্গে—এরা সতীশের গুরু ও বন্ধু উপেন্দ্রের পরিচিত। সতীশের চালচলনে বিদেশিয়ানা আদৌ ছিল না, তবু তার দিকে সরোজিনী আকৃষ্ট হয়, সতীশের মনও সরোজিনীর দিকে কিছু ঝোঁকে। রায় পরিবারে সতীশ সরোজিনীর বিয়ের কথা আলোচিত হতে থাকে। সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী ব্যারিষ্টার শশাঙ্ক মোহন খোঁজ করে' সাবিত্রী-সতীশের ব্যাপার জেনে জ্যোতিষকে জানায়। সতীশকে জিজ্ঞাসা করা হলে সতীশ অকপটে বলে ঃ

…সাবিত্রী কে আমি তা জানি নে…তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সে উত্তর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে…তবে একথা খুবই সত্যি, সাবিত্রী যাই হোক, যদি নিজের ইচ্ছায় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম তাকে মাথায় করে' রাখতুম।…যথার্থই আমি ভাল নই, যথার্থই আমার সঙ্গে কারো সংস্রব রাখা উচিত নয়…আমি ভেবেছিলুম, একদিন নিজেই সমস্ত কথা…জানাব। কিন্তু কোনদিন সে সুযোগ হলো না, সে সাহসও ছিল না।… দোষ আমার। এ আমি প্রতিদিনই টের পাচ্ছিলাম, তাই মনে আমার সুখ ছিল না……অথচ আমি কোন বিষয়ে কাউকে ঠকাইনি, ওসব আমি জানিওনে।

এতে সতীশ ও সরোজিনীর বিয়ের কথা যা চলছিল তা ভেঙে যায় ; কিন্তু সরোজিনীর অনুরাগ টলে না।—পিতার মৃত্যুর পরে সতীশ প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়—দেশের বাড়ীতে ফলাও করে' ডিস্‌পেনসারি হাসপাতাল এসব খোলে, আর এক তান্ত্রিক গুরু ধরে' পঞ্চমকারের সাধনায় রত হয়। বেহারী প্রমাদ গণে' সাবিত্রীর খোঁজে কাশীতে যায় ও তাকে নিয়ে আসে। সাবিত্রীর আগমনে সতীশের তান্ত্রিক সাধনা ঘুচে যায়। সতীশ পুরোপুরি জানতে পারে সাবিত্রী নিষ্পাপ, তার হৃদয়ে সতীশ ভিন্ন আর কারো স্থান নেই ; সতীশ তার দিকে আকৃষ্ট না হয় এই জন্যই সে মিথ্যা বদনাম নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। সতীশের নিউমোনিয়া হয়। সাবিত্রী চিন্তিত হয়ে উপেন্দ্রকে চিঠি দেয়। এর মধ্যে উপেন্দ্রের সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেছে। যক্ষ্মায় তার স্ত্রী সুরবালার মৃত্যু হয়েছে, সে নিজেও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। পুরীতে গিয়ে সে জানতে পায় সতীশ যাকে ভালবাসে সেই সাবিত্রী বাল-বিধবা, তাকে তার ভগিনীপতি বিয়ে করবার লোভ দেখিয়ে বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সাবিত্রী যখন টের পায় তার ভগিনীপতির মতলব ভাল নয় তখন তার আশ্রয় ত্যাগ করে' সে মেসে চাকরি নেয়। সেই সূত্রে সতীশের সংস্পর্শে সে আসে ও তার একান্ত অনুরাগিণী হয়। কিন্তু তাকেও সে এড়িয়ে যায় ও জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করে। সাবিত্রীর চিঠি অনেক ঘুরে উপেন্দ্রের হাতে পৌঁছয়। ততদিনে সতীশ আরোগ্যলাভ করেছে। একদিন উপেন্দ্র ও সরোজিনী তার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। উপেন্দ্র সাবিত্রীকে নিজের ছোট বোন বলে সমাদরে গ্রহণ করলো। ঠিক হলো কালাশৌচ গত হলে সতীশ-সরোজিনীর বিয়ে হবে আর সাবিত্রী নেবে উপেন্দ্রের শুশ্রূষার ভার। তাদের যাবার দিনে সতীশ বেঁকে বসলো, বললে, সে সাবিত্রীকে যেতে দেবে না, তাকে বিয়ে করবে। সাবিত্রী বল্লে ঃ

…সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখে…এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করো না।

উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় সতীশ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বল্লেঃ আমি ভাল নই, বহু দোষ, বহু অপরাধে অপরাধী—তবু কেমন করে সরোজিনী আমাকে গ্রহণ করবেন। বরঞ্চ আমাকে তুমি এ অধিকার দিয়ে যাও যেন কারও ভয়ে, কোনও লোভে, কোনও দুর্বলতায় তাকে না অস্বীকার করি যে আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

উপেন্দ্র বল্লেঃ…সমস্ত জেনেই তোদের আমি এক করে দিয়ে গেলাম।

সতীশ বল্লে—আমাকে নিয়ে কি সরোজিনী সুখী হতে পারবেন ?

সাবিত্রী উপেন্দ্রকে বল্লে—সে ভার আমি নিলুম দাদা,—তুমি নিশ্চিন্ত হও।

উপেন্দ্র বল্লে—আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্য নয় সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।

উপেন্দ্রের আদেশের প্রভাব সাবিত্রীর উপরে কেমন হলো সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য এইঃ

…শুনিয়া পাষাণ মূর্তির মত সাবিত্রী নতনেত্রে বসিয়া রহিল। আজ সতীশ আর একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশ-মাত্র অধিকার রহিল না। তাহার ভাবনায় তাহার বাসনায় তাহার পরম সুখের পরম দুঃখের, তার দুঃসহ বেদনার আজ তাহার চোখের উপরেই সমাধি হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস পর্যন্ত সে পড়িতে দিল না। ব্যথায় বুকের

ভিতরটা মুচ্ড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতী যেমন করিয়া তাহার অন্তরের দুর্জয় অগ্ন্যুৎপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সতীশের পরিচয়ের সঙ্গেই আমরা সাবিত্রীর পরিচয় পেয়েছি। সেই সঙ্গে উপেন্দ্রেরও অনেকখানি পরিচয়, বিশেষ করে' তার শেষ জীবনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জীবনের প্রথম দিকটার কথা আরো একটু জানতে হবে। উপেন্দ্র ছিল সতীশের চাইতে বয়সে কিছু বড়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—পশ্চিমের একটা বড় শহরে ওকালতি করতো। সতীশের বিরাট প্রাণ তার প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল—সে সতীশকে গ্রহণ করেছিল বন্ধুরূপে, কিন্তু সতীশ তাকে একই সঙ্গে জানতো বন্ধু ও গুরু বলে। যাকে বলা হয় নীতিনিষ্ঠ নির্দোষ জীবন উপেন্দ্র ছিল তার পূজারি, সে-জীবনের কোনো ব্যত্যয় সহ্য করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তার স্ত্রী সুরবালা ছিল স্বামী-অন্ত-প্রাণ, সংসার-অনভিজ্ঞা, শিশুর মতো সরল, শাস্ত্রের কথা দেবতা ও মহাপুরুষদের কথা সে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো—তার এই অতিশয় ঋজু চরিত্র ও ধর্ম-বিশ্বাস তার স্বামী পরম প্রেমে নিরীক্ষণ করতো। সতীশ যে কুসঙ্গে মিশে মদ্যপান আরম্ভ করেছে তা সে জানতো না, সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের সম্বন্ধের কথা তার মেসের এক ভদ্রলোক তাকে জানায়। উপেন্দ্র প্রথমে সে কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সস্ত্রীক সতীশের বাসায় উপস্থিত হয়ে সে একজন ভদ্র-গোছের যুবতী মেয়েকে দেখতে পায়। সতীশের পতন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে তৎক্ষণাৎ সে তার বাসা ত্যাগ করে। বহুদিন পরে অবশ্য সাবিত্রীর সত্যকার পরিচয় সে পায় আর তার অসাধারণ চরিত্রের জন্য তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়। উপেন্দ্রের বাল্যবন্ধু ছিল হারাণ। হারাণ দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে অন্তিম

সময়ে উপেন্দ্রকে সংবাদ পাঠায়। উপেন্দ্র সতীশকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় হারাণের ভাঙা বাড়ীতে উপস্থিত হয়। হারাণের চিকিৎসার ত্রুটি হয় না, কিন্তু হারাণ তার ভাঙা বাড়ী বৃদ্ধা মাতা আর অসাধারণ স্ত্রী কিরণময়ীর ভার উপেন্দ্রের উপরে রেখে পরলোক যাত্রা করে।

এই কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তার প্রথম জীবনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এই ভাবে ঃ

> ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলে বেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামিভবনে আসিয়াছিল। শ্বশ্রূ অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর যত্ন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষাদান দিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই।
>
> ...যৌবনে, অজ্ঞাতে, নিরহঙ্কারে দেহের কূল উপকূল যখন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে স্বামীর সহিত সূক্ষ্ম বিচার লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল। কেন যে তাহার দৈহিক নির্যাতন শেষ হইল, কেন যে সে গৃহিণী কর্ত্রী হইয়া উঠিল, একথা সে একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল না। স্বামী বলিতেন সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং আর সমস্ত উপলক্ষ। দয়া, ধর্ম, পুণ্য, এ সমস্তই ওই উপলক্ষ। হয় ইহকালে, না হয় পরকালে; হয় নিজের, না হয় পাঁচ জনের; হয় স্বদেশের না হয় বিদেশের—কি উপায়ে যে সুখের সমষ্টি বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়—ইহাই

জীবনের কর্ম, এবং জানিয়াই হৌক, না জানিয়াই হৌক, এই চেষ্টাতেই জীবের সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ; এবং এইটিই একমাত্র তুলাদণ্ড, যাহাতে ফেলিয়া সমস্ত ভাল মন্দই ওজন করিয়া দিতে পারা যায়। নিজের কি পরের সেদিকে চাহিও না। কিরণ, তুমি কেবল এইটিই বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সুখের মাত্রা বাড়ে কি না।

পণ্ডিত স্বামীর তত্ত্বাবধানে কিরণময়ীর পড়াশুনা ও বুদ্ধির চর্চা অনেক হয়েছিল, হয়নি হৃদয়ের চর্চা। সে ঈশ্বর পরকাল এসব মানতো না, মানতো ইহকাল—ইহকালের সুখ সুবিধা। তার স্বামীর চিকিৎসা করছিল এক নতুন-পাশ-করা ডাক্তার। কিরণময়ীর রূপ-লাবণ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হতে তার দেরী হয়নি, কিরণময়ীও তার আসক্তি লালন করে' চলায় কোনো দোষ দেখেনি। তার পতন আসন্ন হয়ে এসেছিল, এমন সময়ে তাদের বাড়ীতে এলো উপেন্দ্র ও সতীশ। হারাণের সামান্য যা কিছু ছিল সব উপেন্দ্রের নামে উইল করে' দেবার ইচ্ছা হারাণ জ্ঞাপন করলো। আড়ালে থেকে একথা শুনে উপেনকে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে কিরণময়ীর বাধলো না। স্বামীর এমন মুমূর্ষু অবস্থায় তার সাজসজ্জার পারিপাট্য দেখে সতীশ বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু উপেন্দ্র তার ক্ষোভের কারণ বুঝে বললো, কিরণময়ীর যাতে ক্ষতি হয় এমন কিছুই সে করবে না।

হারাণের অন্তিমকালে কিরণময়ী যে প্রাণঢালা সেবা করেছিল তা দেখে সতীশ কিরণময়ীর মহা ভক্ত হয়ে উঠেছিল, উপেন্দ্রও বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু কিরণময়ীর এমন পরিবর্তনের মূলে ছিল উপেন্দ্র আর উপেন্দ্র ও সুরবালার অপূর্ব দাম্পত্য-প্রেমের কাহিনী ; সতীশ তাকে সেই সব কাহিনী বলেছিল। উপেন্দ্রকে দেখেই কিরণময়ী মুগ্ধ হয়েছিল, সেই সঙ্গে বুঝেছিল উপেন্দ্র অপ্রাপ্য, তার পবিত্রতা বজ্রের মতো কঠোর। কিন্তু উপেন্দ্র ও সুরবালার প্রেমের

সংবাদ তাকে প্রেরণা দিয়েছিল নতুন করে' স্বামীকে ভালবাসার সাধনায়। বিধবা হবার পরে একদিন সে সুরবালাকে দেখে এলো, সুরবালার সরল গভীর প্রত্যয় তার মতো পণ্ডিতারও অন্তর স্পর্শ করলো। সেই দিনই ফিরে এসে সে উপেন্দ্রের কাছে অকপটে ব্যক্ত করলো উপেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা কেমন করে' তার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে। এই অনাথ পরিবারের জন্য একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করে' উপেন্দ্র পশ্চিমে ফিরলো তার আশ্রিত একান্ত স্নেহাস্পদ পিসতুত ভাই সত্য-বি-এ ফেল ও পুনঃ-পরীক্ষার্থী দিবাকরকে কিরণময়ীর তত্ত্বাবধানে রেখে।

কিরণময়ী ও অঘোরময়ী দুই জনেরই প্রচুর আদর যত্ন পেয়ে মুখচোরা দিবাকরের জীবন যেন বদলে গেল। সে দুই একটি মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা আরম্ভ করলো। সে সব লেখা কিরণময়ীর চোখে পড়তে দেরী হলো না, কিন্তু তার সমাদর না পেয়ে পেলো উপহাস। এই সূত্রে কিরণময়ী তাকে জানালো কেমন করে' সত্যকার সাহিত্য জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করে, অপরের ধার করা ভাব থেকে কদাচ নয়। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলে কিরণময়ী মন্তব্য করলো ঃ

সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা···এই জন্য নারীর বাল্যরূপ যদি বা মানুষকে আকৃষ্ট করে তাকে মাতাল করে না। আবার একদিন তার সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যায় তখনও ঠিক তাই···শুধু নারী নয় পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

এ সব আলোচনা বুঝবার ক্ষমতা দিবাকরের ছিল না; তবু মনে তার নতুন পুলক জাগলো। বিশেষ করে' কিরণময়ীর বিব্রত-

করা হাসি তামাসা, সান্নিধ্য, তার ভিতরে যেন এক নতুন চেতনার উন্মেষ করলো।

অঘোরময়ী কিরণময়ী ও দিবাকরের এত মেলামেশায় গল্প-গুজবে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল ; বিশেষ করে দিবাকরের দ্বারা তার আর কোনো কাজই হচ্ছিল না সেই জন্য। হঠাৎ একদিন উপেন্দ্র এসে উপস্থিত হলো ; তার কাছে আব্রুহীন ভাষায় কিরণময়ীর নামে অভিযোগ করতে অঘোরময়ীর রুচি বা বুদ্ধিতে একটুও বাধলো না। কিরণময়ী এসব কথার কোনো প্রতিবাদ করলো না, নীরবে উপেন্দ্রের জন্য খাবার প্রস্তুত করলো। উপেন্দ্র সে খাবার খেলে না, কিরণময়ীকে বল্লে, "আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।" কিরণময়ীও অবশ্য কড়া প্রত্যুত্তর করতে ছাড়লো না, বল্লে ঃ "…তোমার রাগ বল, ঘৃণা বল, ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত ? কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা তুমিও তাই।…কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলুম তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এম্‌নি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখনি ! নিজের বেলায় বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশি মিঠে লাগে ঠাকুরপো ?" উপেন্দ্র দিবাকরকে হুকুম করলে তখনই বাক্স বিছানা বেঁধে তার সঙ্গে যেতে। অঘোরময়ীর অনুনয়ে সে-রাত্রির মতো ও বাড়ীতে থাকবার অনুমতি সে পেল। উপেন্দ্র যখন এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন কিরণময়ী অপরের অগোচরে তার পা জড়িয়ে ধরে বল্লে—'আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুর পো, সমস্ত মিথ্যে ! সমস্ত মিথ্যে ! ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি পারলে ভাবতে !" "চুপ করুন! অনেক অভিনয় করেচেন—আর না।" বলে' অসহ্য ঘৃণায় উপেন্দ্র তার মাথাটা সজোরে ঠেলে দিলে, সে পা ছেড়ে দিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। "নাস্তিক! অপবিত্র, ভাইপার" বলে' উপেন্দ্র দৃক্‌পাত না করে' দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল।—সেই রাত্রি ভোর হবার পূর্বেই

অপমানে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞান হারা কিরণময়ী দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দাসীর সহায়তায় আরাকান-যাত্রী জাহাজে গিয়ে উঠলো।

দিবাকর কিরণময়ীর অনুবর্তী হয়েছিল একপ্রকার দিশাহারা অবস্থায়। কিন্তু জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। দুই চক্ষে তার ধারা বইল।

কয়েক দিন ধরে আদর করে' ধমকিয়ে প্রলুব্ধ করে' কিরণময়ী দিবাকরকে বশ করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সব চেষ্টা বৃথা হলো। শেষে সে দিবাকরকে বল্লে দেশে ফিরে যাওয়াই তার উচিত। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রের কথা উঠলো। কথায় কথায় দিবাকর বল্লে ঃ "কাল তুমি বল্লে উপীনদার মাথা হেঁট করে দেবে। সে রাত্রে তোমাদের কি কথা যে হয়েছিল কোন্ রাগে যে এ কথা বলেছিলে তা এখনো আমি ভেবে পাইনে। হেতু তোমার হয়ত আছেই কিন্তু সে-কারণ যাই হোক, ও মাথা হেঁট করার দুঃখ যে কত বড় তা যদি জানতে অমন কথা মুখেও আনতে না। তাছাড়া ওসব মাথা যদি হেঁট হয়েই যায় তবে কোনদিন নিজেদের মাথা তুলব আমরা কোন দিকে চেয়ে?" উপেন্দ্রের মহিমময় চরিত্রের প্রতি দিবাকরের সীমাহীন শ্রদ্ধা কিরণময়রীর অন্তরে যেন এক বিপ্লব ঘটালো। উপেন্দ্রের প্রতি নতুন করে' শ্রদ্ধা বোধ করে' কিরণময়ী নিজের জীবনের পথ ফিরে পেলো। দিবাকরকে রক্ষা করা এখন থেকে তার এক কাজ হলো।

আরাকানে কিরণময়ীকে যেমন যুঝতে হলো অভাব-অনটনের সঙ্গে তেমনি দিবাকরের নবজাগ্রত কামনার সঙ্গে। তার লাঞ্ছনা যেদিন চরমে পৌঁছলো সেদিন সতীশ হাজির হলো তাদের দুজনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তার মুখে তারা শুনলো সুরবালা গত হয়েছে, উপেন্দ্র কলকতায় মরণাপন্ন অসুস্থ।

তারা কলকাতায় পৌঁছলে দেখা গেল কিরণময়ীর মস্তিষ্ক-

বিকৃতি ঘটেছে। পালিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নানরত মেয়েপুরুষদের সে বলতে লাগলো ঃ

…ভগবান কি সত্যি আছেন ? তোমরা কি তাঁকে ভাবতে পার ? ভক্তি করতে পার ? আমি পারিনে কেন ?

সুদীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি খুলে কপালে পিঠে সর্বত্র ছড়িয়ে সে উপেন্দ্রের কামরায় হাজির হয়ে বল্লে ঃ

…সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে। সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে বলেছিল ভগবান আছেন! তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হত……

দিবাকরকে দেখে বল্লে ঃ

তুমি অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ ঠাকুরপো, তোমাকে এরা কি লজ্জা দিচ্চে……

উপেন্দ্রের দিকে চেয়ে বল্লে ঃ

ওকে তোমরা দুঃখ দিওনা ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে সে সত্য একদিনের জন্য ভাঙিনি… আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো, একটু খাবে! হয়ত ভাল হয়ে যাবে।

শেষ ঘনিয়ে আসছে দেখে উপেন্দ্র সতীশকে বল্লে ঃ

চোখে চোখে রাখিস ভাই যতদিনে না আবার প্রকৃতিস্থ হন। কিন্তু তোর ভয় নেই সতীশ, ওঁর অন্তরের আঘাত যে কত দুঃসহ হয়েছে সে উপলব্ধি করবার শক্তি নেই আমাদের, কিন্তু সে যত বড় নিদারুণ হোক অতবড় বুদ্ধিকে চিরদিন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না।

'চরিত্রহীনে'র প্রধান চরিত্রগুলোর ও কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পেলাম তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে ঘটনার বিন্যাসে সংলাপে ভাবালুতা যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে এতে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অন্যান্য রচনায় প্রেম-তন্ময়তার

বা প্রেমে আত্ম-বলিদানের যেমন মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এতেও তাঁর সেই চিন্তা প্রবল—হয়তো প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। সাবিত্রীর আত্ম-বলিদানের দিকে কি গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছেন তা আমরা দেখেছি, কিন্তু শুধু সাবিত্রী নয়, সুরবালা, উপেন্দ্র, বেহারী, সতীশ, প্রত্যেকেরই আত্মোৎসর্গ-পরায়ণ ভালবাসা তিনি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। কিরণয়ীর জীবন প্রচলিত আদর্শের প্রতি বিরূপতায় ও সুখান্বেষণে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু শেষে সেও উপলব্ধি করলো, উপেন্দ্রের প্রতি তার মনে যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল তার বুদ্ধির অহঙ্কার ও নাস্তিক্য নয়, সেই আত্মবিলোপপরায়ণ প্রেমেই তার জন্য জীবনের পথ। কিন্তু যত ভুল সে করেছিল তার দুঃসহ গ্লানি তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটালো।

কিন্তু স্পষ্ট বা প্রবল চিন্তার সাহিত্যে যতটা মূল্য তার চাইতে বেশি মূল্য চরিত্র-সৃষ্টির। সেই চরিত্র-সৃষ্টি চরিত্রহীনে অনেক ক্ষেত্রেই সুসম্পপন্ন হয়নি। চরিত্রগুলোর মুখে কথা অনেক বসানো হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বর্ণনাও কম দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেই সব কথা বা বর্ণনা চরিত্র-প্রকাশক তেমনি হয়নি। সতীশের কথা ভাবা যাক। লেখক দেখাচ্ছেন সাবিত্রীর প্রতি তার অন্তরে যে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে তা গভীর, কতখানি গভীর তা নিজেও সে জানে না। অথচ সাবিত্রীর তরফ থেকে কিছু বাধা বা উপেক্ষা পেয়ে যত অপমানকর কথায় সে সাবিত্রীকে বিঁধলো তাতে এই পরিচয়ই কি পাওয়া গেল না যে ভালবাসা তার অন্তরে যত জায়গা পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি জায়গা পেয়েছে এক ধরণের অহমিকা? হয়তো বলা হবে—এই দুর্বলতা দিয়েই তো তাকে গড়া হয়েছে, তার বন্ধু ও গুরু উপেন্দ্রের উপর রাগ করেও সে কিরণময়ীর কাছে যা তা বলেছিল।—কিন্তু উপেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সে যত কটু কথা উচ্চারণ করেছিল তার চাইতে অনেক বেশি আপত্তি-কর কথা সে সাবিত্রীকে বলেছিল। তা ছাড়া সতীশকে লেখক

যতগুলো উপাদান দিয়ে গড়েছেন অথবা যত গুলো উপাদান তিনি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, সে সবের মধ্যে বড় করে দেখেছেন তার ভালবসার ক্ষমতা। গঙ্গার ঘাটে যেদিন সে সাবিত্রীকে স্মরণ করে' সত্যকার শান্তি পেলে সে দিন তাতে সেই অসাধারণ ভাল্‌-বাসাই আমরা দেখি আর সাঁওতাল পরগণায় জ্যোতিষবাবুদের বাড়ীতে যেদিন সে অকপটে স্বীকার করলো,সাবিত্রী নিজের থেকে চলে না গেলে সে কোনোদিন তাকে ত্যাগ করতো না, সেদিনও সেই পরিচয়ই আমরা পাই। অথচ এতখানি ভালবাসার ক্ষমতার সঙ্গে লেখক তাতে দেখিয়েছেন এক অত্যন্ত হীন ধরণের অহমিকা। সাবিত্রীর প্রতি এমন ভালবাসার সঙ্গেই তার মনে যে সরোজিনী স্থান পেলো এতেও তার চরিত্র ঠিক প্রকাশিত হয়নি। হয়তো বলা হবে জীবনে তো আমরা এমন বৈচিত্র্য বা অদ্ভুতত্ব দেখি। কিন্তু জীবন ও শিল্পের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। জীবনে অনেককেই আমরা ঠিক বুঝি না বা জানি না, কিন্তু শিল্পী যাদের আমাদের সামনে দাঁড় করান তাদের বোঝাবার জন্যই দাঁড় করান। তাদের মধ্যেও বৈচিত্র্য দুর্জ্ঞেয়তা এসব থাকতে পারে, থাকেও, কিন্তু এমন ইঙ্গিতও শিল্পীকে দিতে হয় যাতে তাঁর অত্যন্ত জটিল সৃষ্টিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সামনে অনেক খানি স্পষ্ট চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। সতীশ তার অপূর্ব প্রেম আর অদ্ভুত অহঙ্কার ও খেয়ালিপনা নিয়ে তেমন স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ায় না। হয়তো সে দাঁড়ায় মোটের উপর এক সদাশয় কিন্তু অনেকখানি খেয়ালী স্থূলপ্রকৃতির তরুণ রূপে ; কিন্তু লেখক তো তাকে ঠিক সেই রূপ দিতে চান নি। তার ভিতরে এমন একটা হৃদয় মাঝে মাঝে তিনি উদ্‌ঘাটিত করে' দেখিয়েছেন যাতে মনে হয় আপাত-দৃটিতে সে খেয়ালী এমন কি চরিত্রহীন হলেও আসলে তার চরিত্র উচ্চাঙ্গের, এই লেখকের বক্তব্য। কিন্তু তাঁর সেই বক্তব্য আচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর চিত্রে। তাঁর যে একটি প্রধান চিন্তা—মানুষের অন্তর জিনিসটা

অনন্ত, অর্থাৎ স্ব-বিরোধিতার আর অন্ত তাতে নেই,—সেইটি তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে একটি বিঘ্ন ঘটিয়েছিল মনে হয়।

তেমনি উপেন্দ্রের ব্যাপারেও। উপেন্দ্রকে যে কত মহৎ করে' লেখক অঙ্কিত করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকান-যাত্রার দৃশ্যে। তার মহত্ত্বের সামনে নতশির হয়ে দিবাকর তো উপস্থিত বিপদ কাটিয়ে উঠলোই, কিরণময়ীও সেই মহত্ত্বের সামনে নতশির হয়ে ঘোর দুর্দিনে পথ পেলো। কিন্তু সেই উপেন্দ্রকে আগেকার অনেক দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে অনেকখানি অসহিষ্ণু নীতিবাদী। যত সহজে কিরণময়ীকে সে বলতে পারলো "আপনার ছোঁওয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে" যে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব তাতে আরোপ করা হয়েছে তার অধিকারীর পক্ষে তেমন উক্তি অসম্ভব, কেননা তা যেমন অভদ্র তেমনি অন্যায়। এতবড় একটা অন্যায় যে তার দ্বারা সংঘটিত হলো সে-চেতনাও তাতে যোগ্য ভাবে জাগেনি। এখানেও সেই "মন জিনিষটা অনন্ত'-তত্ত্বের পরিচয় অর্থাৎ মনের অনন্ত স্ববিরোধিতার পরিচয়। কিন্তু জীবনে এটি এক বড় সত্য হলেও আর্টে এর প্রয়োগে সাবধান হতে হয়, কেন না, আর্টে চরিত্র চাইই, নইলে আর্টের সৃষ্টি অনেকখানি অর্থহীন হয়।+

+"আর্টে চরিত্র চাইই"—বর্তমান কালে কোনো কোনো খ্যাতনামা লেখকের লেখায় এই চিন্তার প্রতিবাদ দেখা যাচ্ছে। তবু আমাদের ধারণা আমরা নিবেদন করলাম। এ সম্পর্কে কবিগুরুর কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি! সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায় কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউবা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন...তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।—সাহিত্যের স্বরূপ।

বেহারী, সুরবালা, সাবিত্রী এদের চরিত্র মোটের উপর সুস্পষ্ট হয়েছে, বোধ হয় তার কারণ, এদের চরিত্রে জটিলতা নেই। বেহারী ও সুরবালার চরিত্র জটিল তো নয়ই, সাবিত্রীর চরিত্রও জটিল নয়, কেননা, তার ভিতরে যেমন রয়েছে প্রেম-প্রীতি-উন্মুখ-মন, তেমনি সেই মন পবিত্রতা-অভিসারী—সেই পবিত্রতা তার জীবনে যে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কেন না, অপরের লোলুপ দৃষ্টি তার উপরে পড়েছিল, সেই দৃষ্টি তার উপরে পড়তে সে খানিকটা দিয়েওছিল, এতেই সে নিজেকে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার অযোগ্য মনে করে—যদিও সতীশকে ভালবেসেই সে জীবনের স্বাদ পায়। ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত সাবিত্রীর—এবং শরৎচন্দ্রের আরো অনেক নায়িকার—মনের এ দ্বন্দ্বে দেখেছেন এক ট্র্যাজিডি। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ট্র্যাজিডিজাতীয় হলেও পুরো ট্র্যাজিডি নয়, একে বলা যায় কিঞ্চিৎ ভাগ্য-বিড়ম্বনা—টমাস হার্ডী যাকে বলেছেন life's little ironies সেই জাতীয় ব্যাপার। অভয়া মনের বলে এই ভাগ্য বিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠেছিল, রাজলক্ষ্মীকে কাটিয়ে উঠতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল; কাজেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা-দের জীবনেও এই দ্বন্দ্ব ঠিক ট্র্যাজিডির বা বিড়ম্বনার রূপ নেয়নি যে রূপ নিয়েছিল ট্র্যাজিডির চাইতে সে সব অনেক ছোটখাটো ব্যাপার। বাংলা দেশের সমাজ জীবনের এক বিশেষ স্তরে বিশেষ কালে নারীদের জীবনে এই বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছিল, তারই নিপুণ ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। এ দ্বন্দ্বে এমন কিছু চিরন্তনতা বা বিরাটত্ব নেই—ট্র্যাজিডিতে কিন্তু চিরন্তনতা বা বিরাটত্ব অপরিহার্য।

বেহারী সুরবালা সাবিত্রী এদের সাধু চরিত্র করে' আঁকা হয়েছে তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এরা কি মহৎ চরিত্র ? অর্থাৎ শিল্পে মহৎ সৃষ্টি ? এদের সুন্দর হৃদয় আমাদের খুশী করে, কিন্তু শিল্পে মহৎ তাই যা শুধু হৃদয় ধর্মে মহৎ নয়, মনোধর্মেও মহৎ। এদের কি মনোধর্মে মহৎ বলা যায় ? আমাদের ধারণা—

যায় না। বেহারী বা সুরবালার মধ্যে কোনো মহৎ, অর্থাৎ, বৃহৎ মন যে নেই তা তো স্পষ্ট, সাবিত্রীর বহু দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়েও কোনো মহৎ মনের অর্থাৎ মহৎ মনন-শক্তির জন্ম হয়নি। একটি অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা তার লাভ হয়েছে, তার নির্লোভতাও চমৎকার, কিন্তু এসব সত্বেও সে প্রাদেশিক বেশি, সার্বভৌমিক কম। প্রাদেশিক বেশি বলেই তার ধারণা—"সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বাজায় করে রাখে।" 'চরিত্রহীনে' কিছু পরিমাণে মহৎ চরিত্র অর্থাৎ মহৎ সৃষ্টি বলা যায় কিরণময়ীকে।

চরিত্রহীনের চারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে মাত্র সাবিত্রী অনেকখানি সুঅঙ্কিত। কিন্তু তেমন সুঅঙ্কিত না হয়েও কিরণময়ী একটি মহৎ বা অসাধারণ চরিত্র হয়েছে। অসাধারণ ভাবে বঞ্চিত তার জীবন, সেই সঙ্গে অসাধারণ রূপ-যৌবনের আর অসাধারণ মস্তিষ্কশক্তিরও সে অধিকারিণী। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার মনে জাগা স্বাভাবিক ; কিন্তু তার এত ব্যর্থতা ও বিদ্রোহের মধ্যেও ঘুমিয়েছিল প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নারী। সেই নারী প্রথম জেগে উঠলো আর রূঢ় আঘাত খেলো অনঙ্গ ডাক্তারের সংস্পর্শে এসে ; কিন্তু তারপর অনেকখানি সার্থক হলো উপেন্দ্রকে দেখে। দিবাকরের সঙ্গে তার যে সব আলাপ-আলোচনা রং তামাসা তা কিছু পরিমাণে রং তামাসা কিছু পরিমাণে বঞ্চিত জীবনের অজানিত দাহ। কিন্তু দিবাকরকে নিয়ে তার আরাকান যাত্রাকে কি বলা হবে? তা কি শুধু উপেন্দ্রের উপরে প্রতিশোধ? খানিকটা হয় তো প্রতিশোধ, কিন্তু সবটা নয়। তার পরিচয় রয়েছে আরাকান-যাত্রী জাহাজে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজন সম্বন্ধে দিবাকরের সঙ্গে তার আলোচনায়। দিবাকরকে পরে সে যত বড় নাবালক দেখলো ততটা আশঙ্কা হয় তো আগে তার হয় নি। যাক, শেষে উপেন্দ্রের প্রতি তার শ্রদ্ধা ফিরে পেয়ে সে পথ পেলো এবং সে-পথে নিষ্ঠার

সঙ্গে অগ্রসর হলো। কিন্তু দেহটাকে বাঁচাবার জন্য তার, অথবা শরৎচন্দ্রের যে উৎকণ্ঠা অনেকেই তাকে অদ্ভুত ভেবেছেন, আমরাও তার বেশী আর কিছু ভাবতে উৎসাহ বোধ করি না। শরৎচন্দ্র বলেছেন তাঁর চরিত্র গুলোর শত করা ৯০ ভাগ বাস্তব থেকে নেওয়া। তাঁর কথা অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তাঁকে কল্পনা দিয়ে যে অবশিষ্ট দশভাগ পুরোতে হয়েছে সেই ফাঁক দিয়ে দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে এই অদ্ভুত সংস্কার তাঁর অনেক রচনায় অশোভন ভাবে মাথা জাগিয়েছে। দেহের পবিত্রতার জন্য এমন উৎকণ্ঠা সাবিত্রীতে অবশ্য শোভন, কিন্তু কিরণময়ীতে নয়, কেননা তার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। —তাই এক কিরণময়ীর মধ্যে আমরা দুটি মানুষকে পাচ্ছি—বিদ্রোহী কিরণময়ী আর প্রেম-নিষ্ঠ কিরণময়ী। শুধু সেইটিই অবশ্য আপত্তিকর নয়। আপত্তিকর ব্যাপার এইখানে এইটি যে এই দুয়ের মধ্যে কোনো যোগ ঘটেনি। বিদ্রোহী কিরণময়ীই অবশ্য অনেক বেশি প্রাণবন্ত, তার চিন্তা ও বাণী আমাদের অনেকখানি সচেতন করে তোলে। বহু অসম্পূর্ণতা সত্বেও চরিত্রহীন বাংলা সাহিত্যে একখানি স্মরণীয় উপন্যাস হয়েছে এই বিদ্রোহী কিরণময়ীর গুণে।

চরিত্রহীন যে আমাদের একালের সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার অনেকটা কারণ কিরণময়ী, সতীশ, সাবিত্রী এর এই তিনটি দোষযুক্ত অথচ শক্তিশালী চরিত্র। কিন্তু শুধু এই প্রধান চরিত্রগুলোই নয়, এর নামটিও অনেকখানি এর প্রভাবের মূলে। এই নামকরণের ভিতরে যে একটি সবল বিদ্রোহের, একটি 'ডোন্‌ট্‌ কেয়ারে'র ভাব আছে সেটি পাঠক-সাধারণকে স্পর্শ না করে পারেনি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় সত্যকার কোনো বিদ্রোহ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের চিন্তা বা জীবনাদর্শ এর দ্বারা প্রচারিত হয়নি। কিরণময়ীকে, অর্থাৎ প্রথম দিককার কিরণময়ীকে এক বিদ্রোহের মূর্তি মনে হলেও

আসলে সে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মূর্তি, আর তিন প্রধান চরিত্র-হীনের ভিতর দিয়ে মোটের উপরে কি কথা লেখক বলতে চেষ্টা করেছেন তা ব্যক্ত হয়েছে বইয়ের শেষের দিকে কিরণময়ীর প্রতি সতীশের এই উক্তিতে ঃ

> একি সত্যযুগ যে, পৃথিবী-শুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাকবে? এ হলো কলিকাল, অন্যায় অকাজ ত লোকে করবেই! তার কে আবার জমা-খরচ খতিয়ে বসে আছে? আমার উল্টো বিচার তা ভালই বল আর মন্দই বল বৌঠান, আমি দেখি কে কি কাজ করেচে। হারাণ-দার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্বামি-সেবা; সে ত আমিই চোখে দেখেচি! সেই তুমি হবে অসতী! আমি এ মরে গেলেও বিশ্বাস করবো না!……

আগাগোড়াই শরৎচন্দ্র প্রচার করতে বা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন গভীর প্রেম-প্রীতি, গভীর সমবেদনার বাণী। 'শেষ প্রশ্ন' —এবং 'পথের দাবী'তেও—তিনি অবশ্য কিছু বিদ্রোহ প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন।

বামুনের মেয়ে

শ্রীকান্তোত্তর যুগে আমাদের আলোচ্য উপন্যাস গুলো হচ্ছে শ্রীকান্তের বিভিন্ন পর্ব, বামুনের মেয়ে, গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন আর বিপ্রদাস। বামুনের মেয়ে দিয়ে আমরা এ আলোচনা আরম্ভ করছি, শ্রীকান্ত দিয়ে শেষ করবো। এই সমস্ত উপন্যাস শরৎচন্দ্রের পূর্ণ-পরিণত প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে; খুব জনপ্রিয়ও এগুলো, তাই এদের গল্পাংশের তেমন পরিচয় দেবার

চেষ্টা না করে আমরা প্রধানত বুঝতে চেষ্টা করবো এদের মুখ্য চরিত্রগুলো, আর শরৎচন্দ্রের পরিণত চিন্তা-ভাবনা।

'বামুনের মেয়ে' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। কৌলিন্যের গর্ব যে কত দুর্বল ভিত্তির উপরে স্থাপিত সেইটি দেখানো এর প্রধান উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে গোলক চাটুয্যের মতো পাষণ্ডেরা শাসনের নামে সমাজকে কিরূপ পীড়ন করে' চলেছে তারও ছবি দেখানো। কাজেই এটি প্রচারমূলক উপন্যাস। প্রচারমূলক উপন্যাসও যে উৎকৃষ্ট উপন্যাস হতে পারে 'পল্লী-সমাজে' আমরা তা দেখেছি। কিন্তু 'বামুনের মেয়ে'কে কি বলা হবে?

এটি উপন্যাস হিসাবে তেমন উচ্চাঙ্গের হয়নি এই আমাদের ধারণা এই প্রধান কারণে যে এতে চরিত্র-সৃষ্টিতে তেমন কোনো কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। গোলক চাটুয্যে এতে একটি নির্ভেজাল পাপিষ্ঠ, তা ভিন্ন আর কিছু নয়; জগদ্ধাত্রী, তার কন্যা সন্ধ্যা, জগদ্ধাত্রীর শাশুড়ী সন্ন্যাসিনী কালিতারা, এমন কি গোলক চাটুয্যের শাসন অমান্য করে' যে বিলেতে গিয়ে কৃষি-ডিগ্রী নিয়ে এলো সেই অরুণও খানিকটা ভাল মানুষ, তার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। প্রিয় মুখুয্যের চরিত্রে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে, কিন্তু সেও খানিকটা সহানুভূতি ভিন্ন আর কিছু কি আমাদের কাছে দাবি করতে পারে? পারে না এই জন্য যে যে-বিপদ হঠাৎ তার উপরে এসে পড়ল তার সামনে সে একান্ত হতবুদ্ধি হয়ে গেল, এ ভিন্ন আর কোনো লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া তাতে পাওয়া গেল না। অবশ্য যত বড় বিপদ তাকে হঠাৎ ঘিরে ধরলো তার সামনে একান্ত হতবুদ্ধি হওয়া তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা যা শুধু স্বাভাবিক তারই নয়, সেই মর্যাদা সাধারণত তারই লভ্য হয় যা বিশেষ ভাবে মানবিক। 'পল্লী-সমাজে' রমেশ ও সে যাদের নেতা সেই "ছোট লোকের" দল প্রবল চক্রান্তকারীদের হাতে ঘোর লাঞ্ছনা সয়েও

দমলোনা, জ্যাঠাইমা তো বরাভয় উচ্চারণ করলেন—এদের সবার চরিত্রে একই সঙ্গে সেই স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পদ পল্লী-সমাজের সাহিত্যিক সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত 'মহেশে'র সঙ্গে 'বামুনের মেয়ে'র তুলনা করলেও সেই কথাটা বোঝা যাবে। 'বামুনের মেয়ে'তে প্রিয়নাথ ও তার পরিজনের উপরে যে ঘোর অত্যাচার হলো তেমন অত্যাচার গফুর জোলা ও তার ষাঁড় মহেশের উপরেও হলো; কিন্তু তুর্বল পক্ষ হয়েও গফুর নতি স্বীকার করলো না, বরং নিজের ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানিয়ে চললো, আর শেষে মহেশকে হারিয়ে চোখের জলে বিশ্ববিধাতার দরবারে ক্ষমাহীন অভিসম্পাত জানালো। ইব্‌সেনের সুবিখ্যাত An enemy of the people নাটকেও দেখা যায়, এক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের লোকদের সম্মিলিত স্বার্থ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে একজন সত্যসন্ধ ডাক্তার; অবশ্য কিছু করতে পারলো না সে, কিন্তু হারও মানলো না; নাটকের শেষে ডাক্তারের চরিত্র-প্রকাশক এই মহৎ বাণী উচ্চারিত হয়েছে: The strongest man is he who stands in the minority of one সত্যিকার বলবান সেই যে একা দশের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।—'বামুনের মেয়ে'র কোনো চরিত্রেই চারিত্রিক বীর্য বলতে যা বোঝায় তা তেমন প্রকাশ পায়নি, তাই ওটি এক করুণ কাহিনী হয়েছে, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু হতে পারেনি, যদিও মানুষের দ্বারা ঘটানো এক বড় রকমের তুঃখ ওতে বিবৃত হয়েছে।

গৃহদাহ

'গৃহদাহ' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অল্প কিছুদিন পরে। 'গৃহদাহ' রচনায় শরৎচন্দ্র যে 'ঘরে বাইরে' থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন তা অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথমত, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা যেমন আন্দোলিত হলো তার স্বামী নিখিলেশ আর স্বামীর বন্ধু সন্দীপের আকর্ষণের মধ্যে তেমনি 'গৃহদাহে' অচলা আন্দোলিত হলো মহিম আর মহিমের বন্ধু সুরেশের আকর্ষণের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, নিখিলেশের সঙ্গে মহিমের আর সন্দীপের সঙ্গে সুরেশের অনেকখানি প্রকৃতিগত মিল রয়েছে। তবে মিল যতই থাকুক পার্থক্যও এই দুই উপন্যাসের মধ্যে কম নেই, আর এই দুই উপন্যাসই বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে।

'গৃহদাহে'র প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে মহিম, অচলা, সুরেশ। এদের পরেই উল্লেখযোগ্য অচলার পিতা কেদার মুখুয্যে, মৃণাল, আর ডিহরির রামবাবু। আরো বহু চরিত্র এতে আছে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি প্রধানত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তাই তেমন অর্থপূর্ণ তারা নয়। যে ছয়টি চরিত্রের উল্লেখ আমরা করলাম তারা সবাই কিন্তু কম-বেশি অর্থপূর্ণ সৃষ্টি হয়েছে।

বলা হয়েছে 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের চরিত্রেরসঙ্গে গৃহদাহের মহিমের চরিত্রের মিল রয়েছে। সহজেই এ মিল চোখে পড়ে। নিখিলেশ শান্ত সংযত, জবরদস্তি তার ধাতে নেই, সে স্বাধীনতা ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূজারি। তার স্ত্রীকে তাই সে বল্লে ঃ

> ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে

আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে……যে পেটুক মাছের ঝোল ভালবাসে সে মাছকে কেটে কুটে সাঁতলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভরতি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়াজলের মধ্যেই বশ করতে পারে ত ভালো, না পারে ত ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে—তারপর যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাইনি কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্য তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করিনি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

মহিমের কথা অবশ্য এমন পূর্ণাঙ্গ করে' কখনো ব্যক্ত করা হয়নি। তবে তার আচরণে আগাগোড়াই এটি প্রমাণিত হয়েছে, অন্যের উপরে কোনো জবরদস্তির কথা সে তো ভাবতেই পারে না, তার স্ত্রী অচলার উপরেও তার ইচ্ছার ভার সে চাপাতে অনিচ্ছুক। তবে নিখিলেশের চাইতে তাতে হৃদয়ের অংশ কম, অন্তত তাই প্রকাশ পেয়েছে। বিমলার প্রতি নিখিলেশের ভালবাসা ছিল গভীর, বিমলা তা জানতো, কিন্তু মহিমের সততা ও চারিত্রিক বল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও অচলা এ আশ্বাসে যেন আশ্বস্ত হতে পারেনি যে মহিম তাকে সত্যই ভালবাসে। মানুষ হিসাবে নিখিলেশ মহিমের চাইতে অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ। তবে মহিমও সুনীতি সদাচার এ সবের পুতুল হয়ে ওঠেনি, তাতে সততা ও নীতিধর্ম সত্যই অনেকখানি জাগ্রত। বিমলার অভিযোগ ছিল এই যে তার স্বামী সন্দীপের প্রভাব থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য হাত বাড়ায়নি; অচলারও অভিযোগ কতকটা এই ধরণের। তবে সন্দীপ বিমলাকে যতখানি বলে আকর্ষণ করেছিল অচলাকে সুরেশ

আকর্ষণ করেছিল তার চাইতে আরো অনেক বেশি বলে। মানুষ হিসাবে মহিম আমাদের কিছু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কিন্তু নিখিলেশ যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তা আরো গভীর। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর জীবন-সাধনার ব্যাপকতা ও গভীরতা দিয়ে গড়েছেন নিখিলেশকে ; মহিমের তার স্রষ্টার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নয়। নৈতিক বোধের তীক্ষ্ণতা ও বীর্য শরৎচন্দ্রের যে নেই তা নয়, কিন্তু তা তাঁর অন্তরপ্রকৃতির একটি অংশ মাত্র—সে অংশটিও যে সমগ্রের সঙ্গে খুব সুসমঞ্জস তা নয়। আমরা পরে দেখবো শরৎচন্দ্রের জীবন-দর্শনের ত্রুটি চোখে পড়বার মতো। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি বোধ হয় প্রেম সম্পর্কে ; কিন্তু সে তো মুখ্যত হৃদয়ের ব্যাপার, তাই তার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্ত ঠাঁই সব সময়ে পাওয়া যায় না। মহিমের চরিত্রকে আরো কয়েক দিক দিয়ে দেখবার সুযোগ আমরা পাব অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা কালে।

মহিমের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র সুরেশ—সন্দীপও নিখিলেশের বিপরীত চরিত্র। কিন্তু সন্দীপ একটি ব্যক্তি যতখানি হতে পেরেছে তার চাইতে অনেক বেশী সে একটি ভাবের বা 'আইডিয়া'র প্রতীক—সেই 'আইডিয়া' তার মুখে ব্যক্ত হয়েছে এই ভাবে :

> যেটুকু আমার ভাগ্যে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।...লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হবো প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই।

সুরেশেরও মত এই ধরনের, মৃত্যুকে আসন্ন জেনে অচলাকে সে বলছে :

> আমার বিশ্বাস মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু

নেই। যা আছে সে এই দেহটারই ধর্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম তোমার দেহটাকে কোন মতে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে হয়ত সত্যিই কোনদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তো।···কিন্তু আর তার সময় নেই।

কিন্তু সন্দীপের তুলনায় সুরেশ ব্যক্তি, অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষ, অনেক বেশি। তার দুর্বলতা, দুষ্কৃতি, এসব শরৎচন্দ্র অকপটে এঁকেছেন। সেই সঙ্গে এমন কিছুও তাতে দেখেছেন যার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীর—তাঁর সেই শ্রদ্ধা পাঠকদেরও মনে সংক্রামিত হয়। কি সেই বস্তু? সেটি সুরেশের নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা। বন্ধুর ও আর্তের বিপদে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে সে তো কোনোদিনই ইতস্ততঃ করেনি, ভালবাসায়ও সে লাভালাভ-ভালমন্দ-বিচার রহিত হয়ে তলিয়ে যায়। এই শেষোক্ত অবস্থা অবাঞ্ছিত—ভীতিকর—সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর শিল্পীমন সচেতন এর দুর্লভতা সম্বন্ধেও। ভাল বা মন্দ কোনো কিছুতেই নিজেকে এমন বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা সন্দীপের নেই। সন্দীপের শক্তি ইচ্ছার শক্তি, বুদ্ধির শক্তি—কিন্তু সুরেশের শক্তি হৃদয়ের শক্তি। তাই সন্দীপের হাত থেকে বিমলা অনেকটা সহজেই উদ্ধার পেয়েছিল; কিন্তু সুরেশকে ভয়ঙ্কর জেনেও তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে অচলা যেন একই সঙ্গে চেয়েছে ও চায়নি। আর শেষ পর্যন্ত সে-উদ্ধার সে পায়নি। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

সূচনায় আমরা সুরেশকে পাই একটি অবিকশিত তরুণ রূপে—তার বুদ্ধি, কথাবার্তা—সবই অবিকাশের দ্বারা চিহ্নিত, কেবল তার ভিতরে যে আবেগ রয়েছে সেটি অতিশয় প্রবল। কিন্তু শুধু সেই আবেগ-প্রাবল্য দিয়ে কেমন করে' সে যে মহিমের মতো বিচার-বাদীর মন জয় করেছিল তা বোঝা কঠিন। অচলার মনও সূচনায়

সে জয় করতে পারেনি। তবে তারুণ্যের একটি সহজ আকর্ষণ আছে নারীদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য—একথা বলেছেন গ্যেটে—সুরেশ হয়তো সেই ধরণের আকর্ষণের দ্বারা অচলাকে কিছু আকৃষ্ট করেছিল; আর তার ঐশ্বর্যও যে তার প্রভাব কিছু বাড়িয়েছিল সেকথা শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন। তবে অচিরে সুরেশের তারুণ্যের তরলতা পরিবর্তিত হয়েছিল আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে। শেষের দিকের সুরেশ পূর্ণ-পরিণত যুবা—শুধু যুবার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য নয় বোধের তীক্ষ্ণতা ও সংকল্পের দৃঢ়তাও তাতে লক্ষণীয়।

সুরেশ নিজের বাসনা-কামনাকে সংযত করতে জানতো না—চাইতোও না। অচলাকে দেখে বাস্তবিকই সে মুগ্ধ হয়েছিল—সন্দীপ বিমলাকে দেখে এমন মুগ্ধ হয়নি, সে বরং বিমলার মুগ্ধতার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু সুরেশ অসীম কামনা বুকে ধরেও অপেক্ষা করেছে অচলার প্রসন্নতার জন্য—অন্তত ডিহরীতে অচলা যখন তার একান্ত আয়ত্তের মধ্যে তখন তার সেই পরিচয়ই আমরা পাই। অবশেষে অচলাকে সে পুরোপুরি পেলো। কিন্তু সেই পাওয়াই তার জীবনের পাত্র যেন কানায় কানায় বিস্বাদে ভরে দিলে—সে বুঝলো :

> প্রভাত রবিকরে পথপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্য যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনই করিয়াছে।
> ...মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা...অসহ্য ভারী..

এখানেই তার এমন একটি পরিচয় আমরা পাই যা অপ্রত্যাশিত! সে নাস্তিক, দেহবাদী,—কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের দুঃখ-বিপদও সহজেই তার অন্তরে বাজে,—হয়তো সেই বেদনা-বোধের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার এই নবচেতনার বীজ,—হয়তো অচলার অন্তর-প্রকৃতির সৌকুমার্য তার এই নবচেতনার সহায়ক হয়েছিল। যাই

হোক ডিহরীতে একটি নবচেতনা তাতে জাগলো ; তার ফলে সে বুঝলো অচলাকে তার স্বনির্বাচিত জীবনধারা থেকে ছিনিয়ে এনে কত বড় ভুল সে করেছে। সেই ভুল তার জীবনকে করলো দিশাহারা—শক্তিহীন। সে ঠিক মরবার জন্য প্রস্তুত ছিল না ; কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যু যখন এসে হাজির হলো তখন সে বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে। সঁপে দিলে আমরা বলতে পারিনা—তার এই মৃত্যু যেন এক বিরাট ধ্বংস ; কোনো আশা কোনো সান্ত্বনাই নেই তার সামনে—শুধু যার অসীম দুঃখের কারণ সে হয়েছে সেই অচলার জন্য তার মনের কোণে যে এই কামনা জাগলো 'তার দেওয়া দুঃখও যেন অচলা একদিন অনায়াসে সইতে পারে', এই ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে শুধু সেইটি যেন এক ক্ষীণ কিন্তু অচঞ্চল দীপ-শিখা।

শরৎচন্দ্র ঠিক ট্র্যাজিডির লেখক নন একথা আমরা বলেছি। কিন্তু তাঁর 'গৃহদাহ' একটি ট্র্যাজিডি হয়েছে। এতে দুটো ট্র্যাজিডি ঘটেছে, একটি সুরেশের জীবনে, অপরটি অচলার জীবনে।

অচলার কথা পরে হবে। সুরেশের জীবনে যে ট্র্যাজিডি আমরা দেখছি তা আপাতদৃষ্টিতে এক ভয়াবহ শূন্যতাই—কেননা তার দুষ্কৃতির পরিমাণ ভয়াবহ। কিন্তু এমন একটি সর্বাত্মক ধ্বংসের মতো ব্যাপারের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত এই একটুকু সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে শুধু অন্যায়, শুধু কামনার চরিতার্থতা, এইই তার লক্ষ্য ছিল না—একটি অনির্বাণ প্রেম ও তারই আনুষঙ্গিক গূঢ় শুভকামনা তার অন্তরেও ছিল। সুরেশের শোচনীয় মৃত্যু যে এক সর্বাত্মক ধ্বংসই হলো না, আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ করতে পারলো, তার কারণ তার অন্তরের এই প্রেম আর সেই প্রেমের আনুষঙ্গিক গভীর গোপন শুভানুধ্যান—যার অস্তিত্ব এতদিন যেন তারও অজ্ঞাত ছিল। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সুরেশে দেখেছেন অসীম বৈরাগ্য। অন্তিমে সুরেশের মধ্যে যেন এক তলকূলহীন বৈরাগ্যই আমরা

দেখি। কিন্তু আসলে এটি বৈরাগ্য নয়—শুধু বৈরাগ্য হলে এটি হতো এক বিরাট অহমিকা। এটি এক বিরাট ব্যর্থতাবোধ সন্দেহ নেই, কিন্তু তারই সঙ্গে রয়েছে প্রেমের নীরব শুভানুধ্যানও। অচলাকে সুরেশ সত্যই ভালবেসেছিল; কিন্তু তার এই বড় ভুল হয়েছিল যে সে প্রেমের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যের অহংকার আর লোভকে প্রশ্রয় দিয়েছিল—"পল্লব প্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?" তাই এতখানি অনর্থ তার প্রেমাস্পদার জীবনে তো ঘটালোই, নিজের জীবনও সে বিধ্বস্ত করলো।

অন্তিমে সুরেশকে আমরা দেখি অসাধারণ ভাবে শান্ত আর স্বল্পবাক্। কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমরা বুঝি সে মহিম আর অচলার কাছে অন্তহীন ক্ষমা চেয়ে গেল;—হয়তো জীবন-বিধাতার কাছেও, কেননা, অচলা তার মতো অপরাধীকেও ক্ষমা করতে পারবে এ ভরসা তার মনের কোণে ঠাঁই পেলো।

এক সীমাহীন ব্যর্থতা-বোধ আর কুণ্ঠিত শুভানুধ্যায়ী প্রেম—এই বিষ আর অমৃতের মিলনে সুরেশের জীবন-নাট্যের শেষ ক'টি দৃশ্য এক অবিস্মরণীয় ট্র্যাজিডি হয়েছে।

অচলার জীবন আর সেই জীবনের ট্র্যাজিডি আপাতদৃষ্টিতে কিছু কম জটিল মনে হয়। মনে হয় তার জীবনের ট্র্যাজিডির মূলে তার অনিশ্চয়তা—মহিম আর সুরেশ এই দুইজনের মধ্যে কে যে প্রকৃতই তার প্রেমপাত্র সে সম্বন্ধে সে যেন শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিত হতে পারেনি, আর তাতেই তার অমন সুকুমার আর সংযত জীবনে ঘট্‌লো অমন ব্যর্থতা। এমনি করে' অচলাকে বুঝতে পারলেই পাঠকদের মন খুশী হয়, কেননা, যা একই সঙ্গে অজটিল আর গভীর তার দিকে পাঠকদের পক্ষপাত। কিন্তু শরৎচন্দ্র অচলার ভিতরে আরো খানিকটা জটিলতা এনে দিয়েছেন—সেই জটিলতা এসেছে ঐশ্বর্যের প্রতি তার কিছু আকর্ষণ, আর বিশেষভাবে যে

জীবন-ধারায় সে মানুষ তার যে মজ্জাগত দুর্বলতা (শরৎচন্দ্রের মতে), সেই ছিদ্রপথে।

সূচনায় আমরা পাই অচলার বিয়ে হতে যাচ্ছে মহিমের সঙ্গে ; মহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সচ্চরিত্র, কিন্তু অবস্থাপন্ন নয় আদৌ ; অচলা এসব জানে, জেনেই এ বিয়েতে সম্মত হয়েছে। মহিমের অনুপস্থিতিকালে অচলাদের বাড়ীতে এই বিয়ে ভাঙ্‌তে এলো সুরেশ, মহিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেননা, যদিও সুরেশ নাস্তিক তবু সে হিন্দুসমাজের হিতৈষী, মহিমের মতো একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-সন্তান যে বিয়ে করবে এক ব্রাহ্ম-কন্যাকে এচিন্তা তার অসহ্য। কিন্তু অচলাকে দেখে তার সমস্ত ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ সত্ত্বেও যেন চক্ষের পলকে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। অচলার পিতাকে ও অচলাকে মহিমের অবস্থার কথা সে জানালো, তাতে অচলার পিতার উপরে ভাল কাজ হলো, ধনীর সন্তান সুরেশকে অচলার পিতা সমাদরও বেশ করলেন। এ বাড়ীতে ঘনঘন সুরেশের যাতায়াত হতে লাগলো ; অচলাকে তার মনের ভাব জানাতেও সে দেরী করলো না , অচলার পিতার কয়েক হাজার টাকার ঋণ সে উপযাজক হয়ে শোধ করে' দিলে। এক রকম ঠিক হলো সুরেশের সঙ্গেই অচলার বিয়ে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অচলা জানালে সে মহিমকেই বিয়ে করবে। তাতে সুরেশ ধৈর্য হারিয়ে ঠগ জোচ্চোর ইত্যাদি অকথ্য কথায় অচলাকে ও অচলার পিতাকে গালি দিয়ে কলকাতা ত্যাগ করলো ; আবার কয়েকদিন পরে ফিরে এসে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। মহিমের সঙ্গে অচলার বিয়ে হয়ে গেল। সুরেশের ধনসম্পদ যে তার মনের উপরে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় রয়েছে বিবাহের পরে স্বামীর উদ্দেশ্যে অচলার এই স্বগত-উক্তিতে "প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিনে কেন, সেই আমার স্বর্গ ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।"

কিন্তু পল্লীগ্রামে স্বামীর কুটীরে উপস্থিত হয়ে অচলার পক্ষে এ মনোভাব বজায় রাখা কঠিন হলো। মৃণাল নামে একটি মেয়েকে তার স্বামী নিয়ে এলো তার সাহায্যের জন্য। সে অচলার চাইতে বয়সে কয়েকবছরের বড়, বুদ্ধিমতী, কথায় ও কাজে অতিশয় চট্‌পটে —নিজের স্বামীকে সে বল্লে বায়াত্তুরে বুড়ো, অচলাকে বললে সতীন, তার এই ঠাট্টায় অচলা বিব্রত বোধ করলে ; তবু তার আসার ফলে স্বামীগৃহ তার জন্য কিঞ্চিৎ সুসহ হলো। এই মৃণালের বাবা আর মহিমের বাবা ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মহিমদের বাড়ীতেই মৃণাল মানুষ হয়, এক সময়ে মহিমের সঙ্গে তার বিয়ের কথাও হয়েছিল, মহিমকে সে সেজদাদা মশাই বলে, সেই সুবাদে অচলাকে ঠাট্টা করলো সতীন বলে। মেয়েটি সবাইকে ভালবাসে আর কড়া কথা বলে, তার পঞ্চাশ-পেরোনো স্বামীকেও অতিশয় যত্ন করে। কিন্তু মহিমের প্রতি তার অন্তরের টানকে অচলা ভুল বুঝলো। একদিন অচলা রান্না করলো, কিন্তু সে রান্না না খেয়ে মৃণাল বাড়ী চলে গেল, কেননা তার শাশুড়ী শুচিবায়ুগ্রস্তা। এতে অচলা নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করে' মহিমকে জবাবদিহি করলো। তাদের কথা-কাটাকাটি যখন ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে তখন সুরেশ এসে হাজির হলো তাদের বাড়ীতে।

অচলা চাইলো সুরেশের সঙ্গে নিরিবিলি আলাপের সুযোগ তার না ঘটুক। কিন্তু মহিমের কাছ থেকে সে সম্পর্কে কোনো সাহায্য সে পেল না। সুরেশ নিজের মনের ভাব গোপন করবার লোক নয় ; তার উপস্থিতিতে অচলা ও মহিমের সম্বন্ধের ভারসাম্য যথেষ্ট টলে গেল। তাদের পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝি এতদূর গড়ালো যে অচলা একদিন বলে বসলো ; "সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্য আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।" কোনো অবস্থায়ই বিক্ষুব্ধ হওয়া মহিমের স্বভাবের বাইরে, সে বল্লে ; বেশ, কাল যেন

অচলা সুরেশের সঙ্গেই কলকাতায় যায়। সেই রাত্রেই তাদের বাড়ীতে আগুন লাগলো। অচলার গহনাগুলো ভিন্ন কিছুই রক্ষা পেল না। অমন কড়া কথা বলে অচলার সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। সে তার সমস্ত গহনা স্বামীকে দিয়ে বল্লে, এর দ্বারা পশ্চিমে কোথাও একটা ছোট বাড়ী কিনে তারা বাস করতে পারবে। কিন্তু মহিম তার গহনা নিতে অস্বীকৃত হলো, বল্লে, "...এ ক্ষতি সইবার সম্বল তোমার নেই...তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারবো না।"

অচলা ও তার দাসীকে সুরেশের সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে আর মহিমের বাড়ী আগুনে পুড়ে গেছে শুনে অচলার পিতা অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। তাঁর সন্দেহ নিরসনের জন্য অচলাকে শেষ পর্যন্ত বলতে হলো, পিতার মাথা হেঁট হতে পারে এমন কিছুই সে করেনি।

মহিম তার গ্রামে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লো। সুরেশই গিয়ে তাকে তার নিজের বাড়ীতে এনে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলো আর অচলা ও তার পিতাকে সংবাদ পাঠালো। যেদিন মহিমের বাড়ী পুড়ে যায় সেই দিনই মৃণাল বিধবা হয়েছিল, সেও এসেছিল মহিমের শুশ্রূষা করতে। কঠিন নিউমোনিয়ায় মহিম প্রলাপ বকছিল, তার অবস্থা দেখে অচলা সংজ্ঞা হারালো। পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে মহিমের শুশ্রূষার ভার নিলে। এই শুশ্রূষার ভিতর দিয়ে অচলা আবার যেন নিজেকে ফিরে পেল। মহিম অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। ঠিক হলো অচলা তাকে জব্বলপুরে চেঞ্জে নিয়ে যাবে তার পিতার এক বন্ধুর আশ্রয়ে। কিন্তু যে গাড়ীতে তারা যাচ্ছিল সেই গাড়ীতে শেষ মুহূর্তে সুরেশও উঠলো মহিমের সঙ্গে চেঞ্জে যাবে বলে—মহিমই নাকি তাকে বলেছিল তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, অচলাও নাকি তার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

অচলা ছিল মেয়েদের গাড়ীতে। সে রাত্রি খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। এক স্টেশনে সুরেশ এসে অচলাকে নেমে পড়তে বললো ও তাকে নিয়ে এক ফার্ষ্ট ক্লাশের কামরায় তুলে দিয়ে বল্লে, সে মহিমকে আনতে যাচ্ছে। গাড়ী ছেড়ে দিলে সুরেশ তার সামনে ছুটতে ছুটতে বলে গেল ভয় নেই সে পাশের কামরায়ই আছে।

অচলা সন্দিগ্ধ হলো। শীগগিরই সে বুঝলো তার স্বামী এ গাড়ীতে নেই, সুরেশ তাকে ভুলিয়ে ভিন্ন গাড়ীতে তুলেছে। তার সংজ্ঞা যেন লোপ পেল। কেঁদে সুরেশের পায়ে লুটিয়ে বললো— "কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দিয়েচ?"···ক্রমে অচলা জানতে পেলে সত্যিই তারা চলেছে নরকের পথে। সুরেশ বল্লে···"যে অধঃপথে পথ দেখিয়ে এতদূর টেনে এনেচ, তার মাঝখানে ত ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে না। এখন শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে।" কথায় কথায় সে তাকে গণিকা বলে গালি দিল। অচলা বল্লেঃ "পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য।"

প্রায় ভোরের সময় একটা স্টেশনে অচলা নেমে পড়লো। সুরেশও নামলো। স্টেশনের নাম ডিহরী। গাড়ী কলকাতায় যাচ্ছিল। সুরেশ বল্লে,—"ভেবেছিলাম তুমি সোজা কলকাতায়ই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহরীতে নেমে পড়লে কেন?" অচলা বল্লে, "কলকাতায় আমি কার কাছে যাব?"

স্টেশনের কাছে এক পুরোনো সরাইতে তারা উঠেছিল। সেখানে সুরেশ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার চিকিৎসার জন্য অচলাকেই ব্যস্ত হতে হলো। এই সূত্রে রামবাবু নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাদের আশ্রয় নিতে হলো। সেখানে সবাই জানলো তারা স্বামী স্ত্রী, যদিও অচলা নিজেকে সুরেশের কাছ থেকে দূরেই রাখলো। এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় অচলা ভেবে

তার কূল কিনারা পেল না। কিছুদিন পরে সুরেশ এখানে এক মস্ত বাড়ী কিনলো। বাড়ীর যোগ্য গাড়ী আসবাবপত্র এসবও এলো। কিন্তু অচলা তার এই নতুন ভাগ্যকে স্বীকার করবে কি করবে না তা স্থির করতে পারলো না। যে সমাজে সে মানুষ তাতে ধনের সমাদর কম নয়, বিধবার পুনর্বিবাহের রীতি তো আছেই, স্বামী বর্জন করে' অন্য স্বামী গ্রহণও প্রশংসনীয় না হলেও অবৈধ নয়; তবু তার নতুন ভাগ্যকে গ্রহণ করতে সে তার মনকে পুরোপুরি রাজী করাতে পারলো না। অবশেষে এক রাত্রে পিতৃপ্রতিম রামবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ও তাঁর কাছে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সুরেশের কামরায় সে রাত্রিযাপন করতে গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল "তাহার মুখ মড়ার মতো সাদা, দুই চোখের কোণে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।"

কিন্তু এর পর সে যেন জোর করে' বড়লোকের গৃহিণীর যোগ্য সাজসজ্জা গ্রহণ করলো—এমনি সাজসজ্জা করে' তাদের নতুন জুড়িগাড়ীতে সুরেশের সঙ্গে সে রামবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল—সেখানে তাদের এক বড়লোক আত্মীয় এসেছিলেন। কিন্তু গিয়ে তারা পড়লো মহিমের সামনে—মহিম এসেছিল এই বড়লোকের ছেলের শিক্ষক হয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে অচলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। ফিরবার পথে সুরেশকে সে বল্লে: —"আর কোথাও আমাকে নিয়ে চল।"

সুরেশের নিজের জীবন তার কাছে দুর্বহ, প্রায় অর্থহীন হয়ে উঠেছিল—অচলার জীবন এবং তার জীবনও কতখানি বিড়ম্বিত হয়ে উঠেছে বোধ হয় সেই চেতনা থেকে। দূরে গ্রামে প্লেগ হচ্ছিল। সুরেশ ওষুধপত্র পাঠাচ্ছিল। শেষে অচলাকে না বলে সে নিজেই প্লেগের চিকিৎসায় গেল। দৈবক্রমে তার শরীরে

প্লেগের বীজাণু ঢোকায় তার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলো। তার মৃত্যুশয্যায় মহিমকে সে ডাকলো তার ধনসম্পত্তি দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করবার ভার নিতে। মহিম এলে অচলা সম্বন্ধে সে বল্লে ঃ

> অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসতো, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝোনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন ঘুলিয়ে উঠল যে—যাক। এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেল্লুম—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে।"—

শরৎচন্দ্রের মতে অচলার জীবনের ট্র্যাজিডির মূলে যে সমাজে তার জন্ম সেই সমাজের শিক্ষার বা আদর্শের ত্রুটি। হিন্দু-নারীর যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা জীবনে মরণে একজনকেই অনন্যগতি বলে ভাবা, তাঁর মতে, কেবল সেই শিক্ষাই নারীর সতীত্বকে রক্ষা করতে পারে, এভিন্ন আর কোনো ব্যবস্থাই বিপদের দিনে এ ব্যাপারে কার্যকরী হয় না। ('ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে এই হয়ত শরৎচন্দ্রের সমালোচনা)।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় অচলা সম্পর্কে শরৎ-চন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। অচলার জীবনের ট্র্যাজিডির মূলে তার অনিশ্চয়তাই। সে মন থেকে মহিমকেই স্বামী বলে বরণ করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সুরেশের ভাবাবেগ, তার ধন-সম্পদের প্রলোভন, এসব থেকে নিজেকে রক্ষা করবার তেমন চেষ্টা করেনি। গাড়ীতে সুরেশের দারুণ মতলব সে যখন বুঝলো ও তার দ্বারা অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসিত হলো তারপরও সুরেশের সংস্রব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে' নেবার মতো শক্তি সে নিজের ভিতরে পেলে না ; ডিহরীতে কিছুদিন বাস করার পর এভাবনাও তার মনে এলো যে স্বামী পরিত্যাগ করে' অন্য স্বামী গ্রহণ অবৈধ নয় যদিও নিন্দিত। তারপর রামবাবুর অনুনয়ে পুরোপুরি সুরেশের ঘরণী হওয়া তার পক্ষে আর একটি ধাপ মাত্র। পাতিব্রত্যের

সংকল্প কেন যে কোনো সংকল্প অচলার ভিতরে প্রবল হলে তার জীবনের পরিণতি অন্য রকমের হতো। *

আমরা দেখলাম অনিশ্চয়তাই অচলার জীবনের ট্র্যাজিডির মূলে। কিন্তু ট্র্যাজিডি তো শুধু ব্যর্থতায় নয় সেই ব্যর্থতার সঙ্গে মহৎ-কিছুরও যোগ থাকা চাই। অচলার ক্ষেত্রে কি সেই মহৎ-কিছু?

সেটি অচলার সুরুচি ও স্বভাবগত সংযম। সেই সুরুচি ও সংযম তার কাছে মূল্যবান করেছিল প্রেমে একনিষ্ঠতা আর সদাচার—প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যও অজ্ঞাতসারে তার মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। তাই এক দুর্বার নিয়তি যখন শেষ পর্যন্ত তাকে সুরেশের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে এলো তখন সে-পরিস্থিতিকে যুক্তির দিক থেকে সে খুব দোষাবহ ভাবতে পারলো না, কিন্তু তার অন্তরপ্রকৃতি তাতে সাড়া দিলো না। অচলার রুচি ও স্বভাবের সৌকুমার্য যে বারবার লাঞ্ছিত হলো সেইটিই তার কাহিনীকে এতো করুণ করেছে মনে হয়।

গৃহদাহের তিনটি অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে অচলার পিতা কেদার মুখুয্যে চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়ে বেশি সার্থক হয়েছে। এই চরিত্রে রূপলাভ করেছে দুইটি ব্যাপার, একটি কন্যার কলঙ্কে লজ্জিত পিতার চেহারা, অপরটি, এই দুর্ঘটনা কেদার মুখুয্যের চিন্তায় ও জীবনাদর্শে যে সমূহ পরিবর্তন ঘটালো। প্রথম ছবিটি খুব স্পষ্ট হয়েছে, পাঠকদের মনের উপরে প্রভাবও বিস্তার করে যথেষ্ট। সেই তুলনায় দ্বিতীয়টির প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কম। কেদার মুখুয্যের মর্মপীড়া পাঠকদের মর্মকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে; কিন্তু যে সব যুক্তির দ্বারা তিনি অচলার পতনের জন্য দায়ী করেছেন

---

* একটু ভিন্ন দিক থেকে দেখে বলা যেতে পারে, অচলার এই অনিশ্চয়তার মূলে আমাদের সমাজে নারীর অসহায় দশা আর সুরেশের প্রবল আকর্ষণ।

নিজের সমাজের, অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজের, শিক্ষাকে, তা দুর্বল। নিঃসম্পর্কীয়া অথচ পরমস্নেহবতী মৃণালের সেবার নিপুণতা ও আন্তরিকতা তাঁকে তাগিদ দিল এমন অপূর্ব ব্যাপারের মূল খুঁজে দেখতে। তিনি দেখলেন ব্রাহ্মদের মহা ত্রুটি এই যে তাদের ধর্ম 'সমাজ ছাড়া', অর্থাৎ তা সুস্পষ্ট মতবাদ, সমাজের পরম্পরাগত শিক্ষা-সংস্কারাদির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি মৃণালকে বোঝাতে চাইলেন এই ভাবে ঃ

> মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখী জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার যো নেই মা। এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও-না-কোথাও, কোন-না-কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ঐ জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এতবড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েচ, তোমাদের সেই বিরাট বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিনরাত ভাবচি।

শরৎচন্দ্র এখানে সমাজ ও ধর্মের, অর্থাৎ সমাজের আচার-বিচার নিয়ম-শৃংখলার আর ধর্মের, অর্থাৎ জীবনের নিয়ামক চিন্তাভাবনার, যোগাযোগ সম্বন্ধে একটি জটিল কিন্তু বহু-আলোচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আমরা তাঁর 'শেষ প্রশ্নে' দেখবো এখানে তিনি যে-মত সমর্থন করেছেন তার প্রায় সবটাই সেখানে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে মাত্র একটি কথাই আমরা বলবো, সে কথাটি এই যে সভ্যতার কাজই হচ্ছে সব ক্ষেত্রে—ধর্মের ক্ষেত্রেও—মানুষের সজাগ চেষ্টার পরিমাণ বাড়িয়ে চলা। জগতের বিভিন্ন সমাজ ও ধর্ম আজ পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়েছে, তার ফলে এই সজাগ চেষ্টার পরিমাণ বাড়ানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে—পশু পক্ষীর সহজ সংস্কারের মতো মানুষের পরম্পরা-

গত আচার ও সংস্কার সেখানে তাকে বেশি সাহায্য করতে পারছে না। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তিতে— "সহজের ডাক মানুষের নয় সহজের ডাক মৌমাছির।" তাই কেদার মুখুয্যের সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত কথাগুলো তাঁর বিক্ষুব্ধ হৃদয়-মনের পরিচায়ক বেশ হয়েছে, কিন্তু সেই পরিমাণে বিচারের কথা হয়নি।

মৃণালকে উপলক্ষ করে' শরৎচন্দ্র নারীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে অনেকগুলো কথা বলতে চেয়েছেন। কুমারীকালে হয়তো তার মনে মহিমের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু তার বিবাহ হয় অন্য লোকের সঙ্গে, সে-বর আবার বুড়ো। অচলা এক সময় ইংগিত করেছিল মহিমের সঙ্গে মৃণালের বিয়ে হলেই ভাল হতো, কেননা, "ছেলেবেলায় যে ভালবাসা জন্মায় তাকে উপেক্ষা করা ভাল কাজ নয়।" তার উত্তরে মৃণাল বলেছিল ঃ

> এসব তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ সেজদি? তুমি কি মনে কর ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই? না, মানুষ বিয়ে দেবার মালিক? এ শুধু এ-জন্মের নয় সেজদি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী তাঁর হাতে তিনি সঁপে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কি যায় আসে।

মৃণালের কথা সুস্পষ্ট এবং এই কথার পেছনে যে মতবাদ রয়েছে তাও সুপরিচিত। শুধু হিন্দু সমাজে নয় অন্যান্য বহু সমাজেও এই মতবাদ, অথবা এমনি ধরনের মতবাদ, একদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। শরৎচন্দ্র নতুন করে' এই মতবাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' হয়তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন —নারীর সতীত্বকে যদি আমরা মূল্য দিতে চাই তবে বিবাহের অচ্ছেদ্যতার কথা আমাদের বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে।

শরৎচন্দ্রের এই চিন্তায় শ্রদ্ধেয় অনেক কিছু আছে, সেই সঙ্গে

এতে দুর্বলতার পরিমাণও কম নয়। নারীর সতীত্বের আদর্শ সম্পর্কে ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন :—"পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।" একথার যদি এই অর্থ করা হয় যে মনুষ্যত্বেরই বেশি মূল্য, সে তুলনায় সতীত্বের মূল্য কম, তবে সেটি হবে কদর্থ, এর এই অর্থই করা উচিত যে অন্যান্য ভাল আদর্শের মতো সতীত্বও মহামূল্য, তবে তার যোগ ঘটা চাই পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব-সাধনের সঙ্গে, সেই যোগ না ঘটলে সতীত্ব হয়ে পড়ে এক সংকীর্ণ আদর্শ যার বেশি মূল্য স্বীকার করা কঠিন। মৃণালের পাতিব্রত্যের যে আদর্শের দিকে শরৎচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাতে মস্ত ত্রুটি এই যে, স্বামীটি এখানে প্রতীক-স্থানীয় হয়েছে, কেননা সে বৃদ্ধ, অল্পদিনেই মারা গেল, তার গুণপনার কোনো পরিচয় পাঠকরা পেলে না, মৃণাল যে পেয়েছিল তারও উল্লেখ নেই। প্রতীক নিয়ে মাতামাতি, প্রচার, এ সব চলতে পারে, কিন্তু তাকে সত্যই ভালবাসা যায় না—ভালবাসা বিকশিত হতে পারে ও যারা ভালবাসে তাদের বিকাশের সহায় হতে পারে কোনো রক্ত-মাংসের মানুষের মহৎ গুণাবলীর সঙ্গে যদি তার যোগ ঘটে। ধর্ম নিত্য, শাশ্বত, এসব কথা যত সত্য, ধর্ম কি তা নিরন্তর আবিষ্কার করে' চলতে হয় জীবনের প্রয়োজন ও দায়িত্বের দিকে তাকিয়ে, একথাও অন্ততঃ ততখানি সত্য। শরৎচন্দ্র যে তা জানেন না তা নয়, এর পরেই রামবাবুর চরিত্রে তা আমরা দেখবো। তবে মাঝে মাঝে সেই তীক্ষ্ণ বোধ কেমন করে' যেন তাঁতে আচ্ছন্নও হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানে তাঁর এক বড় পার্থক্য।

মৃণাল তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নির্লোভতা, সেবার আকাঙ্ক্ষা আর চিরাচরিত ধর্মাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে তার সংকীর্ণ পরিবেশে ভালই ফুটেছিল। কিন্তু তাকে কিছু পরিমাণে বিরক্তিকর করা হয়েছে দাম্পত্য-জীবনের প্রাচীন আদর্শের প্রচারক সাজিয়ে। একালের

অচলারা পুনরায় যে মৃণালদের ধারা অবলম্বন করে' সার্থক হবে তা সম্ভবপর নয়; অচলারা সার্থক হবে তাদেরই পথে আরো খোলা চোখে আরো সংকল্প নিয়ে চলে।

বইয়ের শেষে মৃণালের কটি কথা বেশ অর্থপূর্ণ। মহিম তাকে বললে: "অচলা আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।" তার উত্তরে মৃণাল বললে: "পাবে বৈকি সেজদা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষাই ত তোমারই কাছে। আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল সে যে তার কোথায় এখবর আমি সেজদিকে দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।"

শরৎচন্দ্র কি মৃণালের কথায় ইংগিত করছেন যে মহিম অচলাকে যদি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে নাও পারে তবু অচলার আশ্রয়-স্থল তাকেই হতে হবে তার সব অপরাধ সত্ত্বেও? হয়তো তাই, কেন না, অবিচ্ছেদ্য বিবাহের তাই অর্থ। এই সম্পর্কে নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধার কথাও স্মরণীয়; শ্রীকান্তর মুখে তিনি বলেছেন: "স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেননা তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথেঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এসকল শুধু তাহাদের বাহ্য আবরণ; যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে।"

শরৎচন্দ্রের এই চিন্তা বহুমূল্য নিঃসন্দেহ। মানুষের দোষত্রুটি একান্ত করে' দেখা অসার্থক। স্বামীর ও স্ত্রীর তো বিশেষ ভাবেই উচিত পরস্পরের বড় দোষত্রুটিও যথাসম্ভব উপেক্ষা করা— পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে চলা। কিন্তু তবু এ ব্যবস্থা আইন

হতে পারেনা। প্রেম, প্রীতি, উদারতা, এসব স্বতঃ-প্রণোদিত হলে তবেই সার্থক ও সুন্দর হয়—ফরমাস এসব ক্ষেত্রে অচল।

রামবাবুর চরিত্রটিতে ধর্মনিষ্ঠা, আচারপরায়ণতা, এসব বলতে যা বোঝায় তার একটি বড় দুর্বলতার দিকে শরৎচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এঁর সম্বন্ধে তিনি গোড়ায় বলেছেন: "এই বৃদ্ধটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দুধর্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই।" রামবাবুর হৃদয়বত্তার বহু পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে। অচলা ও সুরেশ, বিশেষ করে' অচলা (রামবাবুর বাড়ীতে অচলা সুরমা নামে পরিচিতা), এই বিদেশে-বিভুঁইয়ে যাতে কিছু শান্তিতে ও আনন্দে দিন কাটাতে পারে সেদিকে সর্বদা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু এমন হৃদয়বান ব্যক্তিও যখন জানলেন, অচলা সুরেশের স্ত্রী নয় অথচ তারই হাতের রান্না তিনি খেয়েছেন, ঠাকুরকে পর্যন্ত নিবেদন করেছেন, তখন সুরেশের মৃত্যুর পরে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অচলার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারই বা কি হবে, এসবের জন্য মহিমের উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে' তিনি তীব্র শ্লেষে বলে উঠলেন:

> ওঃ— আপনিও যে ব্রাহ্ম, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু মশাই যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন, আমার সর্বনাশের পরিমাণ বুঝলে এই কুলটার সম্বন্ধে দয়া মায়া মুখেও আনতেন না।

এই বলে তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে কাশীতে ছুটলেন।

অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে কোনো সদ্‌গুণের যদি যোগ ঘটে তবে কার্যকালে সেই গুণ যায় উবে আর অন্ধ সংস্কারই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, রামবাবু চরিত্রটি এই কঠোর সত্যের অদ্ভুত প্রতীক হয়েছে। —সমাজের অনেক ক্ষতস্থান যে শরৎচন্দ্র অশেষ দক্ষতায় উদ্‌ঘাটিত করে' দেখিয়েছেন, শুধু তারই মূল্য হয়তো কম নয়। কতখানি সে-সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারা যায় ভলটেয়ার-আদি সাহিত্যের প্রাচীন দিক্‌পালদের কথা ভাবলে। অনেক সময় মনে হয়, তাঁরা

পুরোনো হয়ে গেছেন কেননা তাঁরা যে সব সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন সে সব আর একালের সমস্যা নয়। কিন্তু আবার দেখা যায়, তাঁরা পুরোনো হননি—তাঁদের নির্দেশ নতুন অর্থ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে নতুন কালে। এই সব ভেবেই আমরা বলতে চেয়েছি, সাহিত্যে সব চাইতে বেশি দাম মানবিকতার। যে সাহিত্য গভীর-ভাবে মানবিকতার প্রকাশক ও সমর্থক তা যেন শুধু সেই গুণেই মৃত্যুর মুঠো এড়িয়ে গেছে।

দেনা-পাওনা

'দেনা-পাওনা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এতে অনেকগুলো চরিত্র আছে, তবে প্রধান চরিত্র দুইটি—ষোড়শী আর জীবানন্দ।

ষোড়শী চণ্ডীগড়ের চণ্ডী-মন্দিরের ভৈরবী—সন্ন্যাসিনী। তার নাম ছিল অলকা। অল্পবয়সে যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সেই জীবানন্দ এখন চণ্ডীগড়ের জমিদার। কিন্তু সেকথা ষোড়শী জানে না —জীবনন্দ তো জানেই না। জীবানন্দ মাতুলের জমিদারি পেয়ে জমিদার হয়েছে। সে যেমন দুশ্চরিত্র তেমনি অত্যাচারী। ঘোর মদ্যপ সে, টাকার তার সব সময়ে দরকার। চণ্ডীগড়ের কাছারিতে সে এসেছে দিন আটেকের মধ্যে হাজার দশেক টাকা আদায় করবার জন্য যদিও তার এই কাছারির তশিল হাজার পাঁচেক টাকা।

এই মহাপাপিষ্ঠ কেমন করে' আগাগোড়া বদলে গেল—প্রজাদের অধিকার সে সম্পূর্ণ স্বীকার করলো, ষোড়শীকে পূর্বেই সে চিনেছিল অলকা বলে, তাকে চাইলো পত্নীরূপে, কেননা, সে মানুষের মাঝখানে মানুষের মতো বাঁচতে চায়—বাড়ী চায়, ঘর চায়, স্ত্রী চায়, ছেলেপুলে চায়, আর মরণ যেদিন আটকাতে পারবে না

সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চায়—ষোড়শীও বহু দ্বিধার পরে শেষে তাকে স্বামী বলে স্বীকার করলো কেননা সে বুঝেছিল স্বামী-সন্তান-যুক্ত যে জীবন তা ভিন্ন আর সব নারীর জন্য বিড়ম্বনা—এইই 'দেনা-পাওনা'র বিষয়। প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে জীবানন্দের উচ্ছৃঙ্খল জীবন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে ; এই পাষণ্ডের মধ্যে এমন একটা পরিণাম-চিন্তা-বিহীন উদাসীনতা আর তার সঙ্গে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা রয়েছে যা বিস্ময়কর।

কিন্তু তার পরিবর্তন হয়েছে অনেকটা নাটকীয়, সত্যকার পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে তেমন কিছুর ছোঁওয়া পাঠকদের মর্মে যেন পৌঁছয় না। টলস্টয়ের 'রেষারেক্শনে'র সঙ্গে 'দেনা-পাওনা' মিলিয়ে পড়লে 'দেনা-পাওনা'র দুর্বলতা সহজেই চোখে পড়বে। প্রথম দিককার জীবানন্দ শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি নিঃসন্দেহ, কিন্তু সমগ্র চরিত্রটি তেমন উচ্চাঙ্গের হয়নি বলেই আমাদের ধারণা হয়েছে। সন্ন্যাসিনী ষোড়শীর ভিতরে লক্ষণীয় হয়েছে তার সুপ্ত বধূত্ব ও মাতৃত্ব। প্রথম দিকে তার নীরব চারিত্রিক বীর্য আর জননেত্রীত্বও চোখে পড়ে ; কিন্তু শেষের দিকে সেসব যেন অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে।

অন্যান্য চরিত্র সুস্পষ্ট, কিন্তু মাত্র ফকির সাহেব কিছু মনে রাখবার মতো—তাঁর প্রসন্নতা, স্বচ্ছ দৃষ্টি আর অবিচলিত স্বভাবের জন্য।

পথের দাবী

'পথের দাবী' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এতে চোখে পড়বার মতো হচ্ছে একটি চরিত্র আর একটি চিন্তা। চরিত্রটি হচ্ছে সব্যসাচী, আর চিন্তাটি হচ্ছে—মানুষের আদর্শের, মানুষের লক্ষ্যের, নিরন্তর পরিবর্তন।

সব্যসাচীকে মোটের উপর একজন অতিমানুষ করে' আঁকা হয়েছে—তার সাহসের অন্ত নেই, কৌশলের অন্ত নেই, ধৈর্যেরও অন্ত নেই ; তার হৃদয়টি যেন পাষাণে গড়া—নারীর প্রেম তাতে বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, বিন্দুমাত্র রেখাপাতও যেন করতে পারে না তার উপরে। তাকে সাধারণ মানবতার ক্ষেত্রে নেমে আসতে দেখি মাত্র একটি ব্যাপারে, সেটি হচ্ছে দেশের পরাধীনতার জন্য বেদনা—সেই বেদনা তাকে শক্তি দিয়েছে অতি অপরিচ্ছন্ন বর্মী পরিবেশে বাসা বাঁধতে, সেখানকার অন্নপানীয় প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে। কিন্তু এই অসাধারণ বিপ্লবীর অদম্য উদ্যমই আমরা দেখি, সেই উদ্যম কি ফল প্রসব করছে, অথবা কোন্ পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তার তেমন কোনো পরিচয় আমরা পাইনা। এই দিক দিয়ে কাহিনীটি দুর্বল।

'পল্লী-সমাজে' আমরা দেখেছি অত্যাচারী ও অন্যায়কারী যারা তারা যে ভীরুও যথেষ্ট সেটি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই অন্যায়ের সোজা প্রতিরোধে তাঁর আস্থা প্রচুর, অহিংস প্রতিরোধ বলতে যা বোঝায় তা তাঁর মনে তেমন সাড়া জাগায় না। বিপ্লবীরা যে তাঁর এতো প্রিয় তার মূলে তাঁর এই মনোভাব। বিপ্লবীদের মতবাদে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি তিনি বুঝতে পারেননি বা চাননি সেই কারণেই।—অবশ্য সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজন কোনোদিন শেষ হবে কিনা বলা কঠিন। তবে নিরস্ত্র প্রতিরোধও যে দিন-দিনই বেশি অর্থপূর্ণ হচ্ছে তাও সত্য।

যে চিন্তাটি এতে মাথা জাগিয়ে উঠেছে, অর্থাৎ মানুষের আদর্শের বা লক্ষ্যের অশ্রান্ত পরিবর্তন, এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকাদের কর্মচেষ্টার সঙ্গে তার যোগ মুখ্যভাবে নয় ; কেননা নায়ক নায়িকারা বিপ্লবী—তারা চাচ্ছে বিদেশী রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করে' দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে ; কাজেই তারা যা চায় তা চিন্তার স্বাধীনতা ঠিক নয় তা বরং চিন্তার একাগ্রতা। তবে রাজনৈতিক

স্বাধীনতা এক মহামূল্য সম্পদ, যোগ্যভাবে সেই সম্পদের অধিকারী হতে হলে দেশের লোকদের ভিতরে ব্যাপকভাবে চিন্তার স্বাধীনতার চর্চার প্রয়োজন—সেই অপেক্ষাকৃত দূর কিন্তু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের পানে চেয়ে লেখক এই নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন।

এই চিন্তা একালে আমাদের দেশে প্রচার লাভ করে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের সাহায্যে। এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনই এই গতিবাদের মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত—আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য নেতারাও প্রায় সবাই গতিবাদী। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় এই চিন্তা শুধু প্রতিধ্বনিত হয়নি, তাঁর অন্তরের অনুরাগ এতে নতুন শক্তিও সঞ্চার করতে পেরেছে। এই নিরন্তর-পরিবর্তন-বাদ এরপর আরো জোরালো রূপ পায় তাঁর 'শেষ প্রশ্নে'। এই মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা সেই প্রসঙ্গে করবো।

শেষ প্রশ্ন

শেষ প্রশ্ন প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে।

'পথের দাবী'তে যেমন সব চাইতে লক্ষণীয় হয়েছে একটি চরিত্র ও একটি চিন্তা, 'শেষপ্রশ্নে'ও প্রায় তেমনি ব্যাপারই ঘটেছে, যদিও বহু চরিত্র এতে ভিড় জমিয়েছে। 'শেষ প্রশ্নে'র সেই সব-চাইতে লক্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে কমল আর সব-চাইতে লক্ষণীয় চিন্তা হচ্ছে—কোনো ধ্রুব বা চিরস্থির আদর্শ নেই, চিরসত্য বলে কোনো কিছু নেই, সব উপস্থিত কালের প্রয়োজনে উৎপন্ন হচ্ছে আর তা সত্য ও সার্থক সেই কালেই—তার বেশি মর্যাদা তাকে দিতে চাইলে অসত্য আচরণ করা হয়, আর তার ফলে জীবন হয় অসার্থক।

এধরনের চিন্তা নতুন নয়। বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক

বলেছিলেন, আমরা এক নদীতে দুইবার স্নান করি না। বৌদ্ধ-দর্শনে ক্ষণিক-বাদ খুব বড় একটা জায়গা দখল করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলাকায় গতিবাদকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন তার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে, যেমন 'পথের দাবী' সম্পর্কে আমরা বলেছি, এর প্রচারে শরৎচন্দ্র এক নতুন তাগিদ অনুভব করেছেন দেশের একালের জীবনের প্রয়োজনে। বর্তমান জগতের নানা মতবাদ, বিশেষ করে' রুশ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যে ব্যাপক ভাঙাগড়ার সূচনা হল সেসবও, তাঁকে নতুন প্রেরণা দিয়ে থাকবে।

এই কথাগুলো যে জীবনের সব ক্ষেত্রে দেশের সব সমাজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সে ইংগিতও শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। কিন্তু 'শেষ-প্রশ্নে' এর বিশেষ প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে। শরৎচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কি দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় রয়েছে কমলের মুখে তাঁর এই ধরনের উক্তিতে ঃ

> কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। এই ত মানব-জীবনের পরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।

> গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতা পূর্ণ করে তোলে। এই হলো মিথ্যা, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, এই হল সত্য ?

> অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতের আলোয়

আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দুচোখ বুজে তাকেই বলব এ আলো নয়, এ মিথ্যা ?

এই সব চিন্তাকে শরৎচন্দ্র রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন কমলের জীবনে ও চরিত্রে। কমলের পরিচয় সংক্ষেপে এই। তার মা বাঙালী, বাবা চা বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার। বাবা ছিলেন পণ্ডিত ও আদর্শবাদী, মায়ের রূপ ছিল কিন্তু রুচি ছিল না, কমলের বাবার মৃত্যুর পরে তিনি মিস্ত্রী জাতীয় একটি লোককে বিয়ে করেন। কমলের বিয়ে হয় শিবনাথের সঙ্গে। শিবনাথ কলেজের অধ্যাপক ছিল, সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শী, দেখতে কন্দর্পের মতো, কিন্তু চরিত্রাংশে দুর্বল—বিবাহের কিছুদিন পরেই কমলকে সে ত্যাগ করে' অন্য নায়িকাতে আসক্ত হলো। কমল কিন্তু এতে এতটুকুও বিচলিত হলো না—কষ্টে-স্থষ্টে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় করে' চললো। তার চালচলনও অত্যন্ত সাদাসিদে; আর এর পর অজিতের সঙ্গে তার ভাব হলো—তার সঙ্গে সে বাস করতে চললো বিবাহ-বন্ধন স্বীকার না করে।

কমলের চরিত্র যা আমাদের সামনে রূপ ধরে ওঠে তাতে দেখি নির্লোভ সে, চরিত্র তার অসাধারণ ভাবে দৃঢ়, আর গত জীবনের দুঃখ-ব্যর্থতার দিকে না চেয়ে সে চেয়ে আছে আসছে যে জীবন তার মহৎ সম্ভাবনার দিকে। এ চরিত্রকে ভাল না বলে উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—তার মতবাদও কি ভাল, অর্থাৎ সত্য ও অবলম্বনযোগ্য ? তার মতবাদের মধ্যে সত্য যে অনেকখানি আছে তা অনস্বীকার্য্য ; কিন্তু তাতে খুব বড় ত্রুটি এইখানে যে, পরিবর্তন জীবনের খুব বড় সত্য হলেও একমাত্র সত্য নয়—কিন্তু কমল যেন পরিবর্তনকে তেমন মর্যাদাই দিয়েছে। পরিবর্তন হচ্ছে প্রকৃতির মহানিয়ম, এর থেকে কারো নিস্তার নেই ; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের স্মৃতি, বিচার-

বুদ্ধি ও কল্পনা—এগুলোর একটিও আর কোনো জীবের মধ্যে নেই, অন্তত স্মৃতি, বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনা মানুষের জীবনে যতখানি কাজ করে সেই ধরনের কাজের পরিচয় অপর কোনো জীবের জীবনে আমরা পাই না। এই স্মৃতি, বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনার গুণে অতীত মানুষের জীবনে চির-বিস্মৃত চির-অস্তমিত নয়, সেই অতীতকেও মানুষের ইতিহাসে বার বার নতুন নতুন ফল প্রসব করতে দেখা গেছে ; আর ভবিষ্যৎও শুধু অজানা নয়, স্মৃতি বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যৎকেও খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা আয়ত্তযোগ্য মানুষ করতে পারে,—অন্তত সেই ধরনের চেষ্টা থেকে সে বিরত হয় না। এই সবের সম্মেলনে মানুষের জন্য একটা নতুন জগৎ তৈরি হয়—সেটি তার মনোজগৎ। মানুষ একই সঙ্গে এই দুই জগতের অধিবাসী—প্রাকৃত জগৎ আর মনোজগৎ। কিন্তু কমলের মনোজগৎ যেন শুধু বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তৈরি, তাতে স্মৃতি ও কল্পনার উপাদান যুক্ত হয় নি অথবা হতে পারেনি, তার ফলে সে-জগৎ কিছু বেশি খেয়ালী, তার কার্যকারিতাও কম। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরুন কমলের যদি একটি ছেলে বা মেয়ে থাকতো —থাকা স্বভাব ও সভ্যতা দুইয়েরই অনুমত—তাহলে শিবনাথের কথা কমল যত সহজে ভুলে যেতে চেষ্টা করলো তা সম্ভবপর হতো কি ? অজিতকে সে সহজেই লাভ করলো, সে ক্ষেত্রেও স্বভাবতই নানা ধরনের বিঘ্ন দেখা দিতো। বিশেষ করে' অজিত যদি অমন বিত্তশালী না হতো। সেই পরিস্থিতিতে—আর পরিস্থিতিটি অদ্ভুত নয়, খুব স্বাভাবিক—তার এই যে কথা "অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতের আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায় দুচোখ বুজে তাকে বলব এ আলো নয়, এ মিথ্যা ?" এটির অন্তর্নিহিত ভাবালুতা বা স্বাপ্নিকতা—romanticism—সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এইটিই শেষ প্রশ্নের

চিন্তাধারার ত্রুটি—এ চিন্তা একপেশে, সমগ্র জীবন—ব্যক্তির জীবন, পরিবেশের জীবন, বিশ্বের জীবন—পুরোপুরি সামনে রেখে এ-চিন্তা অগ্রসর হয়নি। চিন্তাশীলের সামনে মানুষের তিনটি রূপ থাকে—সে কি ছিল, কি হয়েছে, কি হওয়া চাই। কিন্তু মনে হয় 'সে কি ছিল' আর 'কি হয়েছে' মানুষের এই দুই রূপ শরৎচন্দ্রের সামনে আছে, কিন্তু 'কি হওয়া চাই' ঐ রূপের কথা তিনি কম ভেবেছেন, বিশেষ করে' এই কমলের ব্যাপারে। শরৎচন্দ্রের চিন্তার দুর্বলতা আর এক ভাবেও ভাল বোঝা যায়। 'গৃহদাহে' মৃণালের জীবনে যে আদর্শনিষ্ঠার জয়গান তিনি করেছেন, 'শেষ প্রশ্নে' সহজেই তা লাঞ্ছিত হয়েছে। আবার 'গৃহদাহে'র পরে 'বিপ্রদাসে' প্রাচীন ঐতিহ্য কদর পেয়েছে।

মানুষ বিকাশশীল। তাই স্ববিরোধিতা সহজেই তার জীবনে ও চিন্তায় দেখা দেয়। কখনো কখনো এই স্ববিরোধিতা হয় উৎকট—যেমন টলস্টয়ে হয়েছিল। তবে টলস্টয়ের কর্মজীবন অনেক বড় তাই তাঁকে বোঝা কম কঠিন। শরৎচন্দ্রের স্ববিরোধিতা চিন্তায়ই ব্যক্ত হয়েছে বেশি। তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন সেই জন্য বেশ কষ্ট-সাধ্য।

কমল ভিন্ন শেষ প্রশ্নে আর দুটি চরিত্র লক্ষণীয়—রাজেন আর আশুবাবু। রাজেন বিপ্লবী। বিপ্লবীদের সর্বত্যাগের প্রতি শরৎ-চন্দ্রের শ্রদ্ধা সীমাহীন। তবে এই গ্রন্থে রাজেন দুঃস্থদের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছে। রাজেন তরুণ বয়সেই দেশের 'ছোটলোক'দের অর্থনৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু তার কথাবার্তা 'সিনিকে'র মতো হলেও সিনিক সে নয়—দুঃস্থদের প্রতি তার সীমাহীন প্রেম আশ্চর্যভাবে শান্ত ও সংযত। এক অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রতিবেশীর বিগ্রহ উদ্ধার করতে গিয়ে সে ভীষণ ভাবে দগ্ধ হয়, তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে শুনে আশুবাবু অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বল্লেন,—'ভগবান!...তুমি আর

যাই করো এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত করো না।' আশুবাবুর এই প্রার্থনা রাজেনের ও তার জাত সম্বন্ধে আমাদের সবারই প্রার্থনা।

আশুবাবুকে কেউ কেউ বলেছেন একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র। তিনি বড় লোক হয়েও চমৎকার ভাবে নিরহঙ্কার—এটি সবারই চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর মনটি তাঁর বিপুল দেহেরই মতো অনেকখানি ঢিলেঢালা। তিনি একজন ভদ্র সুরুচিসম্পন্ন ভালমানুষ—এর বেশি তাঁর সম্বন্ধে যে বলা যায় তা মনে হয় না।

বিপ্রদাস

'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এটি শরৎচন্দ্রের শেষ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

অনেকেই বলেছেন বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট উপন্যাস। আমরাও তাই বলি। অবশ্য কেউ কেউ যদি একে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেন তাতেও আশ্চর্য হবো না।

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন চরিত্র এতে একটি; দুটিও বলা যেতে পারে—বিপ্রদাস আর বন্দনা। বিপ্রদাস বলরামপুরের বিখ্যাত জমিদার-বংশের সন্তান—পিতার মৃত্যুর পরে সংসারের কর্তা হয়েছে। কিন্তু সংসারের কর্তৃত্ব আসলে তার বিমাতা দয়াময়ীর হাতে। বিপ্রদাস দয়াময়ীকে বিমাতা ভাবতেই পারে না; তাঁরই হাতে সে মানুষ হয়েছে, দয়াময়ী আপন পুত্র দ্বিজদাসের চাইতে বিপ্রদাসকে অনেক বেশি মূল্য দেন, ভালও বাসেন তেমনি। দয়াময়ী অতিশয় আচারপরায়ণা। বিপ্রদাসও আচারপরায়ণ, তার সঙ্গে ভদ্র ও তেজস্বী। গোপনে তার ধ্যানরত মূর্তি দেখে পাশ্চাত্য ধারায় মানুষ বন্দনার জীবনের গতি বদলে গেল। কিন্তু

পাঠকরা বিপ্রদাসকে একজন ভদ্র ও চরিত্রবান মানুষ বলে জানলেও কিসের ধ্যান সে করে, সে ধ্যান কি সম্পদ তাকে দিয়েছে, তার কিছুই তেমন জানতে পারে না। ধ্যানী পরেশ বাবু (গোরার) কি ধ্যান করতেন তা তাঁর আচরণের ভিতর দিয়ে জানা গেল যখন তাঁর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় নেমে এল। কিন্তু তেমন বিপর্যয়ের দিনে বিপ্রদাসকে আমরা দেখলাম সংকল্পে কঠোর আর শেষে সে সংসার ত্যাগ করে' সন্ন্যাসী হলো। অর্থাৎ বিপ্রদাস মানুষটি সম্যকভাবে আমাদের সামনে প্রকাশিত হলো না, আমরা দূর থেকে তার দৃঢ়-পদক্ষেপ-যুক্ত এক আবছা মূর্তি দেখলাম। এতে শুধু বিপ্রদাস চরিত্রটির সৃষ্টি যে তেমন সার্থক হলো না তাই নয়, বিপ্রদাস যে ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তার চেহারাও বোঝা গেল না। ধর্মের মরমী দিক কম অর্থপূর্ণ নয়। কিন্তু ধর্ম-সাধনা যদি না হয় প্রতিদিনের জীবনের অশ্রান্ত উৎকর্ষ-সাধনা তবে তা অর্থহীন হয়।

বন্দনাতে আমরা সূচনায় দেখি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ চেতনা ও আত্ম-সম্মান-বোধ। কিন্তু তার সমাজের তরুণ-তরুণীদের অনেকখানি ছন্নছাড়া জীবন তাকে বীতশ্রদ্ধ করলো সেই সমাজের জীবন-ধারার প্রতি আর নতুন করে' সে আকর্ষণ বোধ করলো বিপ্রদাসের ও বলরামপুরের আচারপরায়ণ জীবন-ধারার দিকে। শেষ পর্যন্ত তার মনোভাব এতখানি বদলে গেল যে তার বিবাহ ও ভবিষ্যৎ-জীবন সম্পর্কে সে তার পিতাকে বল্লে ঃ

> আমার সতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু ভাগ্যে যাঁকে পেলেন সে-স্বামী জগতে দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাসবাবু সাধুপুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ

ভগবান সেখানেই আমাকে নেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যা হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয় কোন ভয় রাখবো না।

জীবনে এ মনোভাব অর্থহীন নয়, কেননা, পিতার পক্ষে কন্যাকে যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করতে চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে এ ব্যবস্থায় সাধারণত সুফলই ফলে থাকে, আর তাই বহু সমাজে এই ব্যবস্থা সুপ্রচলিত। কিন্তু আর্টে এ ব্যবস্থা অচল, কেননা আর্টে সাংসারিক জীবনের চাইতে অনেক বেশি দাম অন্তর্জীবনের। বন্দনার অন্তর্জীবন এখানে আচ্ছন্নই হয়েছে, প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে'র কুমুও একটা ভাবালু আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে তার বধূজীবন আরম্ভ করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চেহারা আমাদের সামনে যা দাঁড়ালো তাতে কুমু মানুষটির একটি পরিচ্ছন্ন পরিচয়ই আমরা পেলাম।

এ চিত্র অবশ্য তাঁদের মনঃপুত হবে যাঁরা মনোজীবনকে চান না, তাকে ভয় করেন—চান সুপরিচিত ধারার অনুবর্তন।—দেখবার আছে, বঙ্কিমচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হলেন তিনি দেবী চৌধুরাণীর বঙ্কিমচন্দ্রেরই জগতে যদিও ঠিক সেইটি তাঁর অভিপ্রেত নয়।

বিপ্রদাসে দয়াময়ী চরিত্রটি মোটের উপর সাধারণ, কিন্তু ভাল উৎরেছে। তার আরম্ভে আর শেষে খুব গরমিল। কিন্তু তাতেই যেন চরিত্রটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আরম্ভে দয়াময়ী আচারপরায়ণা মহাগৌরবান্বিতা জমিদার-গৃহিণী আর মহাগৌরবান্বিতা মাতা। সপত্নীপুত্র বিপ্রদাসকে তিনি এতখানি আপন জানেন, বিশ্বাস করেন, যে তাকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে আদেশ করেন তাঁর গর্ভজাত সন্তান দ্বিজদাসকে কড়া শাসন

করতে যেহেতু তার আচরণ বংশের স্বার্থের বিরোধী হয়েছে। কিন্তু শেষে দেখা যাচ্ছে তাঁর জামাতা ও বিপ্রদাসের মধ্যে বিবাদ হলে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি নিচ্ছেন জামাতার পক্ষ যদিও মানুষ হিসাবে তাঁর জামাতা অতি নীচ আর বিপ্রদাস যেন দেবতা। এর ফলে স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে বিপ্রদাস বাড়ী ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল —বলরামপুরের 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা'র সব দীপ যেন নিভে গেল। দয়াময়ীও শেষে সংসার ছেড়ে বিপ্রদাসের সঙ্গে তীর্থে চললেন।

বাস্তবের রূপ আঁকায় শরৎচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যদিও চিন্তার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তিনি যথেষ্ট খেয়ালী হয়েছেন।

এমন শক্তিশালী শিল্পীর চিন্তার এই দুর্বলতা জাতির মানস স্বাস্থ্যের জন্য যে কিছু বিঘ্নকর তা স্বীকার করতে হবে।

শ্রীকান্ত

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮ সালে, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭ সালে আর চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩ সালে। এটি বোধ হয় শরৎচন্দ্রের সব চাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস। এটি যে অনেকাংশেই শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত অনেকেরই সেই ধারণা। শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি মতে তাঁর চরিত্রগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব; সেই হিসাবে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' যে অনেক পরিমাণে শরৎচন্দ্রের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী হবে এ খুব সম্ভবপর ব্যাপার। তবে জীবনের বিচিত্র ছবি, বিশেষ করে' রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিণতি, এতে এমন যত্নে চিত্রিত হয়েছে যে তা থেকে মনে হয় অন্যান্য শিল্পীর মতো শরৎচন্দ্রও তাঁর এই উপন্যাস রচনায় সংগঠনী কল্পনা ও মননের সাহায্য কম নেন নি।

ভগবান সেখানেই আমাকে নেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যা হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয় কোন ভয় রাখবো না।

জীবনে এ মনোভাব অর্থহীন নয়, কেননা, পিতার পক্ষে কন্যাকে যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করতে চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে এ ব্যবস্থায় সাধারণত সুফলই ফলে থাকে, আর তাই বহু সমাজে এই ব্যবস্থা সুপ্রচলিত। কিন্তু আর্টে এ ব্যবস্থা অচল, কেননা আর্টে সাংসারিক জীবনের চাইতে অনেক বেশি দাম অন্তর্জীবনের। বন্দনার অন্তর্জীবন এখানে আচ্ছন্নই হয়েছে, প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে'র কুমুও একটা ভাবালু আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে তার বধূজীবন আরম্ভ করেছিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চেহারা আমাদের সামনে যা দাঁড়ালো তাতে কুমু মানুষটির একটি পরিচ্ছন্ন পরিচয়ই আমরা পেলাম।

এ চিত্র অবশ্য তাঁদের মনঃপুত হবে যাঁরা মনোজীবনকে চান না, তাকে ভয় করেন—চান সুপরিচিত ধারার অনুবর্তন।—দেখবার আছে, বঙ্কিমচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হলেন তিনি দেবী চৌধুরাণীর বঙ্কিমচন্দ্রেরই জগতে যদিও ঠিক সেইটি তাঁর অভিপ্রেত নয়।

বিপ্রদাসে দয়াময়ী চরিত্রটি মোটের উপর সাধারণ, কিন্তু ভাল উৎরেছে। তার আরম্ভে আর শেষে খুব গরমিল। কিন্তু তাতেই যেন চরিত্রটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আরম্ভে দয়াময়ী আচারপরায়ণা মহাগৌরবান্বিতা জমিদার-গৃহিণী আর মহাগৌরবান্বিতা মাতা। সপত্নীপুত্র বিপ্রদাসকে তিনি এতখানি আপন জানেন, বিশ্বাস করেন, যে তাকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে আদেশ করেন তাঁর গর্ভজাত সন্তান দ্বিজদাসকে কড়া শাসন

করতে যেহেতু তার আচরণ বংশের স্বার্থের বিরোধী হয়েছে। কিন্তু শেষে দেখা যাচ্ছে তাঁর জামাতা ও বিপ্রদাসের মধ্যে বিবাদ হলে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি নিচ্ছেন জামাতার পক্ষ যদিও মানুষ হিসাবে তাঁর জামাতা অতি নীচ আর বিপ্রদাস যেন দেবতা। এর ফলে স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে বিপ্রদাস বাড়ী ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল —বলরামপুরের 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা'র সব দীপ যেন নিভে গেল। দয়াময়ীও শেষে সংসার ছেড়ে বিপ্রদাসের সঙ্গে তীর্থে চললেন।

বাস্তবের রূপ আঁকায় শরৎচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যদিও চিন্তার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তিনি যথেষ্ট খেয়ালী হয়েছেন।

এমন শক্তিশালী শিল্পীর চিন্তার এই দুর্বলতা জাতির মানস স্বাস্থ্যের জন্য যে কিছু বিঘ্নকর তা স্বীকার করতে হবে।

শ্রীকান্ত

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮ সালে, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭ সালে আর চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩ সালে। এটি বোধ হয় শরৎচন্দ্রের সব চাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস। এটি যে অনেকাংশেই শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত অনেকেরই সেই ধারণা। শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি মতে তাঁর চরিত্রগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব; সেই হিসাবে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' যে অনেক পরিমাণে শরৎচন্দ্রের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী হবে এ খুব সম্ভবপর ব্যাপার। তবে জীবনের বিচিত্র ছবি, বিশেষ করে' রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিণতি, এতে এমন যত্নে চিত্রিত হয়েছে যে তা থেকে মনে হয় অন্যান্য শিল্পীর মতো শরৎচন্দ্রও তাঁর এই উপন্যাস রচনায় সংগঠনী কল্পনা ও মননের সাহায্য কম নেন নি।

আমরা 'শুভদা'য় দেখেছি বাইশ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র প্রেম সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিণত ভাবনার পরিচয় দিচ্ছেন। 'শ্রীকান্তে' দেখা যাচ্ছে শ্রীকান্ত তার অন্নদা-দিদির দেখা পেয়েছিল পনেরো-ষোল বছর বয়সে। অন্নদার মতো কোনো অসাধারণ নারীই হয়তো কিশোর শরৎচন্দ্রের মনে সতীত্ব পাতিব্রত্য প্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর ভাবনা সঞ্চারিত করেছিল। তাঁর সেই ভাবনার বহু পরিচয় তাঁর বিভিন্ন রচনায় আমরা পেয়েছি, শ্রীকান্তেও পাবো। শরৎচন্দ্র অবশ্য প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধেই ভাবেন নি, জীবনের আরো বহু ব্যাপারের দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—তারও পরিচয় আমরা পেয়েছি। তবে প্রেমের বিচিত্র রূপ আর দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা যে তাঁর গভীরতম মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা যথার্থ।

শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের সব চাইতে বড় উপন্যাস—এতে স্মরণীয় চরিত্রের সংখ্যাও সব চাইতে বেশি। ইন্দ্রনাথ, অন্নদা-দিদি, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, বজ্রানন্দ, গহর, কমললতা, এতগুলো বিশিষ্ট চরিত্র তাঁর অপর কোনো বইয়ে পাওয়া যায় না। ছোটখাটো স্মরণীয় ঘটনা ও চরিত্র এতে তো প্রায় সংখ্যাহীন—'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারে'র উপাখ্যান, অন্ধকার রাত্রে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তর ডিঙিতে গঙ্গায় ভাসা ও মাছচুরি, দর্জিপাড়ার নতুন-দার নৌকাযাত্রা, অমাবস্যার রাত্রে শ্রীকান্তর মহাশ্মশানের অভিজ্ঞতা, সমুদ্রে সাইক্লোন, টগর ও তার মানুষ নন্দমিস্ত্রি, বর্মী স্ত্রীকে নিয়ে বাঙালী স্বামীর কীর্তি, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-দম্পতি, ডোমদের বিয়েতে মন্ত্রের বিশুদ্ধি, রাজলক্ষ্মীর ভৃত্য রতন, এমন কত ঘটনা ও চরিত্র বাঙালী পড়ুয়াদের স্মৃতিতে স্থায়ী আনন্দ-সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান চরিত্রগুলোর দিকে তাকানো যাক।

'পথের দাবী'র সব্যসাচীকে তো শরৎচন্দ্র মহামানব করেই এঁকেছেন। শ্রীকান্তর ইন্দ্রনাথ তরুণ যুবক মাত্র হয়েও অনেক

ব্যাপারে মহামানবের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ের জোর, বিশেষ করে' তার সাহস, মহামানবেরই মতো। তার অকপটতাও অসাধারণ—শ্রীকান্তর মতে, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মতে, তার সেই অসাধারণ অকপটতা তাকে এক পরমাশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী করেছিল। শ্রীকান্ত তাতে কোনো ত্রুটি দেখেনি—দেখা অসম্ভব ছিল ; শরৎচন্দ্রও যেন তাতে কোনো ত্রুটি দেখেন নি। কিন্তু তার যে ছবি আমরা পাচ্ছি তা থেকে বোঝা যায় আসলে সে একটি অ-সাধারণ বা অদ্ভুত চরিত্র—তার এক অংশ অসাধারণ ভাবে বিকশিত, অপর অংশ অসাধারণ ভাবে অবিকশিত। সে অল্প বয়সেই একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে' যায়—খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ধারণা সন্ন্যাসী হয়ে সে দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু তার পক্ষে তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধগুহায় প্রবেশলাভ অথবা অকালমৃত্যু লাভও কম স্বাভাবিক নয়। শ্রীকান্ত তাকে নিজের চাইতে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ বলে জানতো। কিন্তু শ্রীকান্ত যেমন ইন্দ্রনাথ থেকে এবং আরো বহুজনের কাছ থেকে বহু ভাবে প্রেরণা লাভ করে' নিজের অন্তর্জীবন সমৃদ্ধ করেছিল সে শক্তি যে ইন্দ্রনাথের ছিল না এইটি ছিল তার বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। মহৎ পরিণতির মূলে একই সঙ্গে সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায় হৃদয়-শক্তি আর বিকাশশীল মস্তিষ্ক-শক্তি।

অন্নদা একটি অসাধারণ চরিত্র সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাকে শ্রীকান্ত যে পতিব্রতা-শিরোমণি রূপে দেখেছে সেখানে একটু বিশ্লেষণ করে' দেখবার প্রয়োজন আছে। তার অমন স্বামীকে সত্যই সে ভালবাসতো, তার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় অবশ্য আমরা পাই। কিন্তু কি ধরনের সেই ভালবাসা ? যাকে বলা হয় 'অন্ধ' প্রেম তা কি তাই ? অন্নদার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, দায়িত্ববোধও অসাধারণ। তার স্বামী তার বিধবা বোনের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে হত্যা করে' পালিয়েছিল। এমন স্বামীর প্রতি 'অন্ধ' ভালোবাসা যদি

এক সময়ে তার থেকেও থাকে তবু পরে তা যথেষ্ট বদলে না যাওয়া অস্বাভাবিক—অমানবিক। স্বামীর এই কাজে অন্নদা যে মর্মাহত হয়েছিল সে কথা সে নিজেই বলেছে। তাহলে পাতিব্রত্যের এখানে অর্থ কি? স্বামীর কাজের কোনো বিচার না করে' তাঁর অনুবর্তন, শ্রদ্ধায় ও কর্তব্যবোধে, সেটি তো এক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়নি। অন্নদা নিজে বলেছে—স্বামী যখন জাত দিলেন তারও সেই সঙ্গে জাত গেল, স্ত্রী সহধর্মিণী বৈত নয়। এর উপর আছে জন্মান্তর সম্বন্ধে তার দৃঢ় সংস্কার। অর্থাৎ অদৃষ্টের বিধান বা ভগবৎ-বিধান বলেই অন্নদা তার জীবনের এতবড় বিপর্যয় মেনে নিয়েছিল—সেইটি মনে হয় তার মুখ্য ভাবনা, তারই অনুগত হয়েছিল স্বামীর অনুগমন—দুর্জন স্বামীরও প্রতি তার সীমাহীন ক্ষমা ও করুণা—মাতা যেমন অসীম মমতায় সহ্য করে সন্তানের শত অত্যাচার অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। কিন্তু একে সোজাসুজি পাতিব্রত্য নাম দিয়ে এর চেহারা ঝাপসা করে' ফেলা হয়েছে, প্রকাশ তেমন করা হয়নি। এ সম্বন্ধে শ্রীকান্ত হয়তো কিছু সচেতন হয়েছিল অভয়ার এই কথায়:

> সংসারে সব নর-নারী এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে আমরা শেষে আলোচনা করবো।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে খুব চোখে পড়বার মতো চরিত্র হচ্ছে অভয়া। এক হিসাবে সে শরৎ-সাহিত্যে অনন্যা। তার কিছু সাদৃশ্য কমলের সঙ্গে, কিন্তু কমল নামে ও ভাষায় বাঙালী হলেও মেজাজে জাতীয়তা-বর্জিত। কিন্তু অভয়া বাঙালী হিন্দুর মেয়ে, তার সেই সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলে অন্য সমাজে সে যাবে না। এই তার সংকল্প, আর সেই সমাজে থেকেই সে তার স্বাভাবিক

অধিকার দাবি করছে যা তার সমাজ অন্যায় ভাবে তাকে অস্বীকার করেছে। কি অধিকার সে চায়? সে বলছে ঃ

> আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে-পুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'ত শ্রীকান্ত বাবু? আর সেই নিস্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারীজন্মের সব চেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন। তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়ে আমি আর সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্ত বাবু!···একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া করে রাখবার জন্য এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্ত বাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মলাভ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের মত বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ

> বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। না হলে তারা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।*

শ্রীকান্তর সংস্কারে বাধলেও সে অভয়ার এই দাবির যাথার্থ্য সর্বান্তঃকরণে স্বীকার না করে' পারলো না। তার উক্তি এই ঃ

> ···সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমনিই বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব ; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে ; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিও না।

বলা বাহুল্য এ স্বীকৃতি শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি। চিরাচরিত সংস্কার শরৎচন্দ্রের মধ্যে কম প্রবল ছিল না—তাঁর রচনায় তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তিনি মানুষটি আসলে ছিলেন দরদী—প্রেমিক—বিশেষ করে' যারা বঞ্চিত যারা অত্যাচারিত তাদের ব্যথায় তিনি ছিলেন একান্ত ব্যথিত। তাঁর অভয়া আর গফুর জোলা তাঁর সেই গভীর ব্যথার অপূর্ব সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সেই ব্যথা অত্যন্ত সত্য বলেই এরা এমন প্রাণবন্ত হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে

---

* মোহিতবাবু অভয়ার চরিত্রকে ভুল বুঝেছেন। সে বিবাহিত, কাজেই স্বামী যদি তাকে চায় তবে তারই ঘর তাকে করতে হবে এই নিয়তি সে স্বীকার করে নিয়েছিল। অবশ্য তার সঙ্গে এও সত্য যে রোহিণীবাবুর ভালবাসা তার মনে দাগ কেটেছিল। স্বামীর হৃদয়হীনতা তাকে রোহিণী বাবুর দিকেই ঠেলে দিল, আর সেই ভাগ্য সে বরণ করে নিলে। তার চারিত্রিক বীর্য প্রকাশ পেল তার নতুন সংকল্পে যা কাণ্ডজ্ঞান-সমর্থিত আর মানবিক যদিও হিন্দু-সংস্কারের বিরোধী।

যে অন্তরে অন্তরে এদের দাবির সত্যতা স্বীকার না করে' আমরা পারিই না—মুখে ওজর আপত্তি জানাবার দিনও যে এত শীগগির ফুরিয়ে যাবে এ আমরা ভাবিনি।

তৃতীয় পর্বে বিশিষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে বজ্রানন্দ আর সুনন্দা। বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্নাসী সে মাত্র এই ব্যাপারে যে সে গেরুয়াধারী আর স্ত্রীত্যাগী। সন্ন্যাসীর জপতপ গাম্ভীর্য যেন তার ত্রিসীমানায় নেই—সব সময় তার হাসিখুশি ভাব, আর ভাল খাবার পেলে সে রীতিমত আনন্দিত হয়। কিন্তু তবু সবার প্রিয় এই সন্ন্যাসীটি বাস্তবিকই মোহবর্জিত। অন্য মোহ তার তো নেইই, স্নেহও তাকে বাঁধতে পারে না। রাজলক্ষ্মী তাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসে, তাকে ছেড়ে দিতে তার চোখে জল আসে। বজ্রানন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে বলে, "আশ্চর্য এই বাংলা দেশটা। এর পথে ঘাটে মা বোন, সাধ্য কি এদের এড়িয়ে যাই।" কিন্তু চমৎকার এড়িয়েও সে যায়, গিয়ে 'ছোটলোক'দের সেবায়, তাদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে ডুবে যায়। আবার স্বচ্ছন্দে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়। বজ্রানন্দ যেন এক অপূর্ব যৌবনের মূর্তি—সে যৌবন পূর্ণবিকশিত, কিন্তু তার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সহজ আনন্দ, অলোভ, আর অমত্ততা, আর তার বীর্যের পরিচয় অশ্রান্ত শুভ-সাধনায়। সন্ন্যাসী এমন মন কাড়তে পারে —সাহিত্যে এটি বিরল।

সুনন্দাকে তার স্রষ্টা অপূর্ব রূপ লাবণ্য দিয়ে সৃষ্টি করে' আবার নিজেই তার প্রতি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করেছেন। অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করবার মতো কিছু ত্রুটি তাতে রয়েছে, তবু তার রূপ লাবণ্য অপূর্ব। আমরা সেই দিকেই চাইবো, তার স্রষ্টার অপ্রসন্নতাকে তেমন আমল দেবো না।

সুনন্দার বড়-জা কুশারী-গৃহিণীকে রাজলক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত বেশি

পছন্দ করলো, বলা যেতে পারে এ পক্ষপাত শরৎচন্দ্রেরই। সুনন্দার বড়-জার মতো স্নেহমমতাময়ী নারী যেমন আমাদের সমাজে তেমনি আমাদের সাহিত্যে বেশ চোখে পড়ে—সেটি আমাদের সৌভাগ্য ; কিন্তু সুনন্দার মতো তীক্ষ্ণ-নৈতিকবোধ-সম্পন্না নারী 'লাখে না মিলয়ে এক'। অবশ্য তার এই অপূর্ব আত্মিক সম্পদের সঙ্গে মিশেছে শাস্ত্রনির্দেশিত কৃচ্ছ্রসাধনার দিকে তার কিছু নেশা—সে-নেশা রাজলক্ষ্মীকে কিছুদিনের জন্য পেয়ে বসলো আর শেষে তা কেটে যাবার পর রাজলক্ষ্মী সুনন্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু সুনন্দার নৈতিক চেতনা তার চরিত্রে যে অপূর্ব দৃঢ়তা দিয়েছে তার শুভ ফলও তার সমস্ত পরিবেশে আমরা দেখতে পাই—সুনন্দার সংকল্পের দৃঢ়তা ভিন্ন কুশারী মশাইয়ের মতি যে সুপথে যেত না তা যথার্থ। এই দিকটায় রাজলক্ষ্মী ও শরৎচন্দ্র কম তাকিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের আঁকা ছবির দাম যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের চাইতে আমরা বেশি দিচ্ছি, আমাদের ধারণা, শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মূল্যায়নে এই রীতি অবলম্বন না করে' উপায় নেই। তাঁর ভিতরে স্পষ্ট স্ব-বিরোধ রয়েছে, সে জন্য তাঁর মতামত সম্বন্ধে আমাদের সব সময়েই একটু বেশি হুঁসিয়ার হতে হবে। কিন্তু বাস্তবকে দেখবার অদ্ভুত চোখ ছিল তাঁর, সেজন্য তাঁর আঁকা ছবির অনেক মূল্য—অসার্থক বা কম চিত্তাকর্ষক সে সব যেন হতেই পারে না।

চতুর্থ পর্বের বিশিষ্ট চরিত্র গহর ও কমললতা। গহর পল্লী-কবি—শ্রীকান্তর বাল্যবন্ধু। লেখাপড়া সে সামান্যই জানে ; কিন্তু ছেলেবেলায় কবিতার নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল, সে সংকল্প করেছিল রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখে কীর্ত্তিবাসকে হারিয়ে দেবে—সে নেশা তার আর কাটেনি। বারো বৎসর ধরে সে তার কাব্যের সাধনা করে' চলেছে, কত যে লিখেছে তার অন্ত নেই। শ্রীকান্তকে দিন সাতেক ধরে তার কাব্য শুনতে হলো। শুনে নিঃশ্বাস ফেলে সে নিজের মনে বললে—'এ সব কোন্ কাজে

লাগবে!' শুধু এই ভেবে সে একটু সান্ত্বনা পেল—লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটে আপনি শুকোয়; বিশ্ববিধানে যদি সে সবের কোন সার্থকতা থাকে তবে গহরের সাধনাও ব্যর্থ নয়।

এই ক্যাপাটে পল্লী-কবি কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে একেবারে খাঁটি সোনা। সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ আমাদের মুগ্ধ করেছে—অন্তরের দিক দিয়ে গহরও তারই মতো নির্লোভ আর সুন্দর। তার বাবা প্রচুর ধন সম্পত্তি রেখে গেছে, কিন্তু তার মন ধনের দিকে যায়ই না। তার পিতামহ ছিল ফকির—বাউল গান আর রাম-প্রসাদী গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতো, সেই পথচারী ফকিরের সে যথার্থ সন্তান। শ্রীকান্তকে সে বললে'—"তোর কাজ কি বর্মায় গিয়ে। আমাদের দুজনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দুভায়ে এখানেই এক সঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।" আর একদিন সে বললে, "বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে সে আমার কাজে লাগলো না—কিন্তু তোদের (শ্রীকান্ত ও তার ভাবী স্ত্রীর) হয়ত কাজে লেগে যাবে।

গহরের পিতা মাতা অনেক দিন হলো গত হয়েছে, স্ত্রীও মারা গেছে। কিন্তু তার বাড়ীর পাশে মুরারিপুরের আখড়ার কমললতা বৈষ্ণবীকে সে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছে। কমললতা তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এত ভালবাসলেও গহর কখনো মুখ ফুটে তাকে কিছুই বলে না। তার এই গভীর ভালবাসা এক নীরব আত্মনিবেদন।

অল্প দিনেই তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো। মঠের লোকদের আপত্তি সত্ত্বেও কমললতা একান্ত যত্নে তার সেবা করলো। মৃত্যুর পূর্বে গহর তার সমস্ত সম্পত্তি নানাভাবে দান করে গেল, কমল-লতার জন্যও কিছু দিয়ে গেল—যদি সে নেয়।

গহরের নির্লোভতা, বিশেষ করে' তার চরিত্রের আশ্চর্য ঋজুতা

আমাদের সবারই চিত্ত গভীর ভাবে স্পর্শ করে। শ্রীকান্তর কথাই আমাদের মনে পড়েঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটে আপনি শুকোয়।

কমললতা বৈষ্ণবী দেখতে কুৎসিত নয়, সুন্দরীও তেমন নয়; কিন্তু সে গহরকে মুগ্ধ করলো। শ্রীকান্ত কোনো নারীর দ্বারা মুগ্ধ হয়নি, কিন্তু কমললতা তাকেও মুগ্ধ করলো। তার গ্লানিময় ও দুঃখময় জীবনের কাহিনী সে একদিন অকপটে শ্রীকান্তকে বললো। কমললতা নিজের জীবনের সব গ্লানি অকপটে শ্রীকান্তর সামনে মেলে ধরেছে শুনে রাজলক্ষ্মীও নিজের জীবনের সবকথা শ্রীকান্তকে বলে' মনের ভার হালকা করলো। কিন্তু এই বয়সেই কমললতা অনেক দাগা পেয়েছিল তাই নতুন করে' আর কোনো বাঁধন স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একসময় সে শ্রীকান্তকে ডেকেছিল বৃন্দাবন-যাত্রায় তার সঙ্গী হতে, কিন্তু শেষে সত্যই যখন তাকে মুরারিপুরের আখড়া ছেড়ে যেতে হয়েছিল আখড়ার কর্তাব্যক্তিদের বিধানে (কেননা সে গহরের বাড়ী গিয়ে তার অসুখের সময়ে সেবা করেছিল) তখন শ্রীকান্তকে সে বলেছিল:

> আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্য তুমি ভেবে ভেবে আর মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

কমললতার ঘরের মায়া ঘুচে গিয়েছিল—বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা তাকে এক অপার্থিব আনন্দের সন্ধান দিয়েছিল। তার স্বভাবের এই অবন্ধনের মাধুর্যই শ্রীকান্তের ভিতরকার ভবঘুরেকে নতুন করে' জাগিয়ে তুলেছিল।

তার চরিত্রের তেমন মূল্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেন নি ; কিন্তু মোহিতলাল তাকে অমূল্য জ্ঞান করেছেন—তিনি তাতে দেখেছেন অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ। আমাদের মনে হয়েছে এই দুই মতের মাঝামাঝি জায়গায় কমললতার সত্যকার স্থান। তাকে কোনো বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রতিমূর্তি জ্ঞান করলে আমরা তার বিশিষ্ট মানবিক রূপটি হারাবো। সে আমাদের মনকে সত্যই আকৃষ্ট করে ; তার অকপটতা নির্লোভতা ও অবন্ধনের ভাবের সঙ্গে সে একান্ত স্নেহময়ী—এইসব সেই আকর্ষণের মূলে।

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র যদি নিজেকে চিত্রিত করে' থাকেন তবে বুঝতে হবে শরৎচন্দ্রের পরিণত জীবন তাতে প্রতিফলিত হয়েছে, কেননা, তিনি নিজে বলেছেন, নবযৌবনে তাঁকে এমন অনেক কিছু করতে হয়েছিল যাকে ভাল বলা যায় না। কিন্তু শ্রীকান্তে তেমন মন্দ কিছুর চিহ্ন নেই। উপন্যাসের মধ্যে শ্রীকান্তর ভূমিকা মোটের উপর দর্শকের ভূমিকা—অবশ্য সেই দর্শক যেমন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন তেমনি তীক্ষ্ণ-ন্যায়-অন্যায়-বোধ সম্পন্ন। যাকে সাধারণত কাজ বলা হয়, অর্থাৎ টাকা পয়সা-আদি উপার্জন, তাতে তাকে কিছুদিনের জন্য ব্যাপৃত দেখি মাত্র বর্মায়। কিন্তু আসলে এই দর্শক হওয়াও শ্রীকান্তর জন্য হয়েছে এক বড় কাজ। ন্যায়-অন্যায়-বোধ সজাগ রেখে আর বিশেষ করে' তার অতিশয় সজাগ দুটি চোখের সাহায্যে সে প্রধানত মানুষের ভিতরে আর কখনো কখনো প্রকৃতির ভিতরে যে সব অপূর্ব সম্পদের সাক্ষাৎ পেলো তাতে তার জীবন তো সার্থক হলোই, পাঠকরাও বুঝলো, এমন দেখাই এক অসাধারণ কাজ—জীবন-সাধনা।

এই অসাধারণ দর্শকের জীবনে একটি সমস্যাও দেখা দিলো পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কাল থেকে। শ্রীকান্ত গান বাজনা কিছু জানতো (শরৎচন্দ্রও জানতেন)। জমিদারের

আমাদের সবারই চিত্ত গভীর ভাবে স্পর্শ করে। শ্রীকান্তর কথাই আমাদের মনে পড়েঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটে আপনি শুকোয়।

কমললতা বৈষ্ণবী দেখতে কুৎসিত নয়, সুন্দরীও তেমন নয়; কিন্তু সে গহরকে মুগ্ধ করলো। শ্রীকান্ত কোনো নারীর দ্বারা মুগ্ধ হয়নি, কিন্তু কমললতা তাকেও মুগ্ধ করলো। তার গ্লানি-ময় ও দুঃখময় জীবনের কাহিনী সে একদিন অকপটে শ্রীকান্তকে বললো। কমললতা নিজের জীবনের সব গ্লানি অকপটে শ্রীকান্তর সামনে মেলে ধরেছে শুনে রাজলক্ষ্মীও নিজের জীবনের সবকথা শ্রীকান্তকে বলে' মনের ভার হালকা করলো। কিন্তু এই বয়সেই কমললতা অনেক দাগা পেয়েছিল তাই নতুন করে' আর কোনো বাঁধন স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একসময় সে শ্রীকান্তকে ডেকেছিল বৃন্দাবন-যাত্রায় তার সঙ্গী হতে, কিন্তু শেষে সত্যই যখন তাকে মুরারিপুরের আখড়া ছেড়ে যেতে হয়েছিল আখড়ার কর্তাব্যক্তিদের বিধানে (কেননা সে গহরের বাড়ী গিয়ে তার অসুখের সময়ে সেবা করেছিল) তখন শ্রীকান্তকে সে বলেছিলঃ

> আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্য তুমি ভেবে ভেবে আর মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

কমললতার ঘরের মায়া ঘুচে গিয়েছিল—বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা তাকে এক অপার্থিব আনন্দের সন্ধান দিয়েছিল। তার স্বভাবের এই অবন্ধনের মাধুর্যই শ্রীকান্তের ভিতরকার ভবঘুরেকে নতুন করে' জাগিয়ে তুলেছিল।

তার চরিত্রের তেমন মূল্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেন নি ; কিন্তু মোহিতলাল তাকে অমূল্য জ্ঞান করেছেন—তিনি তাতে দেখেছেন অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ। আমাদের মনে হয়েছে এই দুই মতের মাঝামাঝি জায়গায় কমললতার সত্যকার স্থান। তাকে কোনো বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রতিমূর্তি জ্ঞান করলে আমরা তার বিশিষ্ট মানবিক রূপটি হারাবো। সে আমাদের মনকে সত্যই আকৃষ্ট করে ; তার অকপটতা নির্লোভতা ও অবন্ধনের ভাবের সঙ্গে সে একান্ত স্নেহময়ী—এইসব সেই আকর্ষণের মূলে।

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র যদি নিজেকে চিত্রিত করে' থাকেন তবে বুঝতে হবে শরৎচন্দ্রের পরিণত জীবন তাতে প্রতিফলিত হয়েছে, কেননা, তিনি নিজে বলেছেন, নবযৌবনে তাঁকে এমন অনেক কিছু করতে হয়েছিল যাকে ভাল বলা যায় না। কিন্তু শ্রীকান্তে তেমন মন্দ কিছুর চিহ্ন নেই। উপন্যাসের মধ্যে শ্রীকান্তর ভূমিকা মোটের উপর দর্শকের ভূমিকা—অবশ্য সেই দর্শক যেমন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন তেমনি তীক্ষ্ণ-ন্যায়-অন্যায়-বোধ সম্পন্ন। যাকে সাধারণত কাজ বলা হয়, অর্থাৎ টাকা পয়সা-আদি উপার্জন, তাতে তাকে কিছুদিনের জন্য ব্যাপৃত দেখি মাত্র বর্মায়। কিন্তু আসলে এই দর্শক হওয়াও শ্রীকান্তর জন্য হয়েছে এক বড় কাজ। ন্যায়-অন্যায়-বোধ সজাগ রেখে আর বিশেষ করে' তার অতিশয় সজাগ দুটি চোখের সাহায্যে সে প্রধানত মানুষের ভিতরে আর কখনো কখনো প্রকৃতির ভিতরে যে সব অপূর্ব সম্পদের সাক্ষাৎ পেলো তাতে তার জীবন তো সার্থক হলোই, পাঠকরাও বুঝলো, এমন দেখাই এক অসাধারণ কাজ—জীবন-সাধনা।

এই অসাধারণ দর্শকের জীবনে একটি সমস্যাও দেখা দিলো পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কাল থেকে। শ্রীকান্ত গান বাজনা কিছু জানতো (শরৎচন্দ্রও জানতেন)। জমিদারের

তাঁবুতে পিয়ারীর গান তার বেশ ভাল লাগলো। কিন্তু শীগগিরই পিয়ারী কিছু খোঁচা দিয়েই তাকে বললে জমিদারের মোসাহেবি ত্যাগ করে' অন্য কোনো ভাল পথ দেখতে। শ্রীকান্ত বিরক্ত হলো, কিন্তু শীগ্‌গিরই জানলো পিয়ারী তার ছেলেবেলাকার পরিচিতা রাজলক্ষ্মী—যে পাঠশালায় সে সরদার পোড়ো ছিল সেই পাঠশালায় রাজলক্ষ্মীও পড়তো আর তার মার খেতো, কিন্তু মুখ বুজে তাকে পাকা বৈঁচিফলের মালা যোগাতো। সেদিনে ম্যালেরিয়ায় রাজলক্ষ্মীর পেটটা ছিল হাঁড়ির মতো হাত পা কাঠির মতো আর চুলগুলো যেন তামার শলা। সেই রোগা মেয়েটি শ্রীকান্তকে যে ভালবাসতো শ্রীকান্ত তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু দেখা গেল রাজলক্ষ্মীর জীবনে বহু ওলটপালট ঘটে গেছে, আজ সে অতুল রূপলাবণ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারিণী পাটনার বিখ্যাত পিয়ারী বাঈজী। কিন্তু এত পরিবর্তনের মধ্যেও ছেলেবেলার সেই ভালবাসার দীপশিখা তার অন্তরে নেভেনি, বরং শ্রীকান্তর সঙ্গে নতুন করে' পরিচিত হবার ফলে তা যেন নতুন তেজে জ্বলে উঠ্‌লো।

রাজলক্ষ্মীর গভীর প্রেম শ্রীকান্তকে স্পর্শ করলো। কিন্তু তাতে সে একই সঙ্গে হলো বিস্মিত লজ্জিত আর আনন্দিত। এতদিন তার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ছিল তার অন্নদা দিদি—সন্ন্যাসিনী, পরম পবিত্রা। প্রেম বলতেও সে বুঝতো তারই মতো একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেম। কিন্তু আজ কিনা তার লাভ হলো এক পতিতার প্রেম এবং তা সে প্রত্যাখান করতে পারলো না। নিজের দশার এই বর্ণনা সে দিয়েছে :

> আমি টের পাইয়াছি, মানুষ শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে ; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও

নয়। ...আমি ত নিজে জানি আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ' করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ—হিপোক্রিট, তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট আমি ছিলাম না; হম্‌বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাতে জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার একেবারে ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না!

শীগ্‌গিরই জমিদারের তাঁবু থেকে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী অর্থাৎ পিয়ারী বাঈজী দুজনেই চলে গেল—রাজলক্ষ্মী গেল পাটনায় শ্রীকান্ত গেল গ্রামে তার বাড়ীতে। এরপর শ্রীকান্তর কিছুদিন কাটলো এক সন্ন্যাসীর দলে। সেখান থেকে অসুস্থ হয়ে সে রাজলক্ষ্মীর শরণ নিলো। রাজলক্ষ্মীর একান্ত যত্নে মরণাপন্ন অসুখ থেকে সে সেরে উঠলো। রাজলক্ষ্মীর এক আত্মীয়ের পুত্র রাজলক্ষ্মীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখছিল। সে তাকে মা বলতো। সে তরুণ যুবক, সম্প্রতি এণ্ট্রান্স পাশ করেছে। সে কি মনে করবে এই ভেবে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বাড়ী যেতে বললো। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর এই আচরণের অর্থ বুঝলো। তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে সে বল্লে:

বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়। ছোট-খাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ এক পদও নড়াইতে পারিত।

এরপর শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে এলো চাকরির খোঁজে বর্মায় যাবার সংকল্প নিয়ে। রাজলক্ষ্মী বল্লে—"আজ অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূর দেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।" শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর কথায় সম্মত হলো না। রাজলক্ষ্মী বল্লে, তার টাকা যা আছে তা কি কোনোদিন শ্রীকান্তর কাজে লাগতে পারে না? শ্রীকান্ত বল্লে, "না, কোনোদিন না।" রাজলক্ষ্মী আর একটি কঠিন প্রশ্ন তাকে করলে: "পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে থাক, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলায়ই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে অভাবে পড়ে একদিন যা করেছি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন?" রাজলক্ষ্মী সব ছেড়েছুড়ে শ্রীকান্তর সঙ্গে বর্মায় যেতে চাইলে। শ্রীকান্ত বল্লে: "তোমাকে সঙ্গে নিতে পারি নে বটে, কিন্তু যখনই ডাকবে, তখনই ফিরে আসবো। যেখানেই থাকি চিরদিন আমি তোমারই থাকবো রাজলক্ষ্মী।"

বর্মা থেকে শ্রীকান্ত অভয়ার কথা রাজলক্ষ্মীকে লিখলো। উত্তরে রাজলক্ষ্মী লিখলো…"তিনি (অভয়া) বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নেই; তিনি শুদ্ধমাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য।"……

বর্মা থেকে ফিরে শ্রীকান্ত দেখলো রাজলক্ষ্মীর ভিতরে বেশ একটু পরিবর্তন ঘটেছে—সে যেন অনেকখানি গৃহস্থ-জীবন ও সন্তানের কাঙাল হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্ত বুঝলো অভয়ার প্রভাব তার উপরে পড়েছে। রাজলক্ষ্মীকে সে বললে: "লক্ষ্মী, তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে?"

রাজলক্ষ্মী চায় না যে শ্রীকান্ত সম্ভ্রম ত্যাগ করে; কিন্তু সে বললে; "তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্য কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধুলোর মত ফেলে দিয়েছে সে কথা তুমি জান না কিন্তু আমি জানি।

শ্রীকান্ত বাড়ী ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সংবাদ পেয়ে সেই গ্রামে রাজলক্ষ্মী এসে হাজির হলো যদিও এক সময়ে তার মা সেখানে রাষ্ট্র করেছিল রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকান্ত গ্রামবৃদ্ধদের সামনে রাজলক্ষ্মীর কুণ্ঠা দেখে বল্লে: "তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী।"

শ্রীকান্তর কঠিন ম্যালেরিয়া হয়েছিল। হাওয়া বদলের জন্য তাকে নিয়ে রাজলক্ষ্মী গেল সাঁইথিয়ার কাছে গঙ্গামাটিতে বাস করতে। এর পূর্বেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। এইবার সে নিজেকে বল্লে:

> যে পিয়ারীকে তুমি জানতে না সে জানার বাহিরেই তোমার পড়িয়া থাক। কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকেই তুমি সকল চিত্ত দিয়া গ্রহণ কর এবং যাঁহার হাত দিয়া সংসারে সকল সার্থকতা নিরন্তর ঝরিতেছে ইহারও শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ভিতরে এক নতুন সংগ্রাম চলেছিল। এর পূর্বেই সে একজন গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিল, গঙ্গামাটিতে শাস্ত্রজ্ঞা সুনন্দাও তাকে কৃচ্ছ্রসাধনার নতুন মন্ত্র দিলে। এর ফলে অলক্ষিত ভাবে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে যেন এক দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হলো। শ্রীকান্ত বর্মায় ফেরার সংকল্প নিয়ে গ্রামে ফিরলো, রাজলক্ষ্মী গেল পশ্চিমে।—বর্মা যাত্রা করবার আগে শ্রীকান্ত একবার কাশীতে গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে,

রাজলক্ষ্মী তাই বলে দিয়েছিল। গিয়ে দেখলো রাজলক্ষ্মী থান কাপড় পরেছে, তার মাথার অমন সুন্দর চুল সব কেটে ফেলেছে। দেশে ফিরে এসে শ্রীকান্তর এক বিয়ে জুটে গেল। জোটালেন তার বাবার মাতুল তাঁর বড় শ্যালিকার নাত্‌নির সঙ্গে। তাঁদের কথা ঠেলে ফেলা শ্রীকান্তর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। সে রাজলক্ষ্মীর মত চেয়ে পাঠালো। রাজলক্ষ্মী লিখলো :

> …ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার জপতপ পূজা-অর্চনা থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।
>
> স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু যদি আমাকে অপমান করার ফন্দি করে থাক, সে বুদ্ধি ত্যাগ করো। তুমি দিলে বিষ আমি নেব, কিন্তু ও নিতে পারব না।

পাত্রীটির পাত্র জুটিয়ে দিয়ে শ্রীকান্ত গেল তার বাল্যবন্ধু গহরের বাড়ীতে। তার অদূরে মুরারিপুরের আখড়া—সেই আখড়ায় কমললতা বৈষ্ণবীর সঙ্গে তার পরিচয় হলো।

কমললতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। শ্রীকান্তও তার দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিল সে কথাও আমরা জেনেছি। কিন্তু এই মুগ্ধ হওয়া কি ধরনের? শ্রীকান্তর মধ্যে যে একটি ভবঘুরে ছিল সে মুগ্ধ হয়েছিল কমললতার ভিতরকার বাঁধনহারাকে দেখে—এই আমাদের মনে হয়েছে। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় বলছে :

> যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।

কমললতার প্রতি শ্রীকান্তর ভালবাসা সেই 'ব্যাপ্তভাবে

আকাশে মুক্ত থাকা' জাতীয় ভালবাসা ; তাই গ্রন্থের শেষে বিদায় নিয়ে যাবার কালে কমললতা যখন শ্রীকান্তকে বললে ঃ

> আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্য ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

তার উত্তরে শ্রীকান্ত বললে ঃ

> তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।

মোহিতবাবুর মতে শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের মিলন ঘটেনি, ঘটেছিল কমললতার সঙ্গে। উপরে শ্রীকান্তর যে উক্তি আমরা উদ্ধৃত করলাম—আর এইটি গ্রন্থে তার শেষ উক্তি—সেটি স্পষ্টভাবেই তাঁর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। এ ভিন্ন শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বেই রাজলক্ষ্মী বলছে ঃ

> আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? অমনি নিষ্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেবো না।

শ্রীকান্তও কমললতা ও রাজলক্ষ্মী দুজনকে তার মনে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ভাবছে ঃ

> জানি সে (কমললতা) পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশাহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায়

অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমে সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে আসনে অধিষ্ঠিত তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

শ্রীকান্তর এমন স্পষ্ট উক্তির পরেও কেমন করে যে মোহিতবাবু সিদ্ধান্ত করলেন যে শ্রীকান্তর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর মিলন ঘটেনি তা ভেবে পাওয়া শক্ত।

রাজলক্ষ্মীর জীবনে মিলন এলো বহু বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে। সেই সব বিড়ম্বনাকে কেউ কেউ ট্যাজিডির মর্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই তা দেওয়া যায় না, কেননা রাজলক্ষ্মীর কাহিনী শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলনের পথে শ্রীকান্তকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হলো। সে সবের মধ্যে তার নিজের সম্ভ্রমবোধের বাধাই সব চাইতে বড়। কিন্তু সে বাধা সে বহু দ্বিধার পরে জয় করতে পারলো পবিত্রতার দিকে সুন্দর জীবনের দিকে রাজলক্ষ্মীর অশ্রান্ত গতি দেখে—সেই গতি অর্থহীন করেছিল তার এক সময়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি।

ছোটখাটো ঘটনা ও চরিত্র বলতে আমরা যে সবের ইংগিত করেছি সে সব এতই পরিচিত যে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও পাঠকদের কাছে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। তবে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-দম্পতি, বিশেষ করে ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে আলোচনার কিছু প্রয়োজন আছে। উল্টা-পাল্টা-ব্যবহার-যুক্ত অদ্ভুত চরিত্র শরৎচন্দ্র আরো ঢের এঁকেছেন, কিন্তু এই অগ্রদানী ব্রাহ্মণী সে সবের মধ্যে মিশে যায় না তার মহার্ঘ হৃদয়-সম্পদের গুণে। দারিদ্র্য, সমাজের অবোধ আর নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার, স্বামীর নির্বুদ্ধিতা, এ সব তাকে এতখানি ধৈর্যহীন করেছে যে

বিশিষ্ট অতিথির অপমানকর কথা তার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে যায় ; কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে তার দেরী হয় না ; তখনো কোনো নাটকীয় আচরণ তাতে প্রাকাশ পায় না, প্রকাশ পায় গ্রাম্য সমাজের স্বাভাবিক ভদ্রতা, অথচ ভিতরে ভিতরে নিজের আচরণের জন্য সে যে দুঃখিত, কিছু লজ্জিতও, এটিও অপ্রকাশিত থাকে না। বাংলার এক কোণের এই একটি বহু-সংস্কারে-আচ্ছন্ন সাধারণ মেয়ে ধরনে-ধারনে প্রাদেশিক ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ ও সমবেদনা-বোধ তাকে করে তুলেছে সার্বভৌমিক। কিন্তু বিরাজ-বৌ-এর বিরাজের চোখ বিশেষ সংস্কারের দিকেই, তাই প্রাদেশিকতা তার ঘুচলো না। যে সব চরিত্র অত্যন্ত প্রাদেশিক তারাই কেমন করে সার্বভৌমিক হয়ে ওঠে প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাহিত্যে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শরৎচন্দ্রকে আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি এক সময়ে ভেবেছিলেন দুর্নীতির প্রচারক। এর পরই সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমাদের করতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে পরিচয় আমরা পেলাম তাতে দেখা যাচ্ছে—আসলে তিনি সুনীতি, সদাচার, পবিত্রতা, প্রেম ও শ্রদ্ধার বন্ধনে বদ্ধ দাম্পত্য জীবন, এসবেরই প্রচারক। অবশ্য সকলের উপরে তিনি মানব-দরদী, দুঃস্থ ও অত্যাচারিতদের জন্য তাঁর বেদনা যেন সীমাহীন—যারা ভুল করে' অথবা অবস্থার চক্রে বিপথে পা বাড়িয়ে সমাজের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছে তাদেরও তিনি জানেন দুঃস্থ ও অত্যাচারিত বলেই।

স্বীকার করতেই হবে তাঁর এই মনোভাব অতি শ্রদ্ধেয় মনোভাব, সভ্য ও বিচারসম্মত জীবনের জন্য যাকে বলা যায় irreducible minimum যতটুকু নইলে নয়, তাই। দেশ চলেওছে সেই irreducible minimum-কে স্বীকৃতি দেবার পথে।

কিন্তু তাঁর এই অসাধারণ গুণের সঙ্গে অনেক ত্রুটিও যে যুক্ত,

তারও কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি—সে সবের মধ্যে খুব চোখে পড়বার মতো হচ্ছে বিচার আর ভাবালুতা এই দুইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর দোল খাওয়া। তাঁর রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশের বিশেষ আবেদন বাঙালী পাঠকদেরই কাছে, এও আমরা দেখেছি।

—কিন্তু মানুষের জন্য আর সত্যের জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেম যে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয় নাই, আর অসাধারণ তাঁর অঙ্কন-ক্ষমতা—এতে তাঁর প্রতিভা এক মহৎ মর্যাদারই অধিকারী হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি অবিস্মরণীয়; বৃহত্তর জগতেও সমাদৃত হবার মতো সম্পদ তাঁর রচনায় রয়েছে—একথা কালে কালে আরো স্বীকৃত হবে এই আমাদের ধারণা।

শরৎচন্দ্র বাংলার সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হন ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব' সমেত তাঁর অন্তত পনেরোখানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই বেরিয়ে যায়—তার কোনোটি পাঠকসমাজে অনাদর পায় না, বরং সমাদর পায়। তাই বলা যেতে পারে, প্রথম পাঁচ বৎসরেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েছিল—তাঁর প্রভাবকাল আরম্ভ হয়েছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে এই বড় ব্যাপারটিও স্মরণীয় যে এটি ছিল বাংলার সাহিত্য-জগতের উপরে রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যাহ্ন কাল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রভাবও যে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছিল তা যথার্থ।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রভাব বলতে কোন্ বিশেষ ব্যাপার বুঝতে হবে? চিন্তা বা সাহিত্যাদর্শের কোন্ বিশেষ রূপ? আমরা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে যতটা পরিচিত হয়েছি তাতে দেখেছি, বাস্তব জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও শরৎচন্দ্র মুখ্যত ছিলেন সুনীতি, সদাচার, পবিত্রতা, প্রেম ও শ্রদ্ধার বন্ধনে বদ্ধ দাম্পত্য-জীবন, এই সবেরই প্রচারক। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনায়ই এই অভিযোগ ব্যাপক হয়েছিল যে তাঁর লেখায় ঘোর অনাচার ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে—সে-সব মোহন রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন:

> পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় এই কথাটা আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল।

এই উক্তিটি তিনি করেন ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য

সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে। কিন্তু তার বহু পূর্বে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যে তাঁর সাহিত্যের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন তারও উল্লেখ রয়েছে উক্ত ভাষণেই।

পাঠকসাধারণের এই ধরনের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করা যেতেও পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নতুন লিখিয়েদের দলেও যেসব অস্বস্তিকর নতুন প্রবণতা দেখা দিল সে সব আর উপেক্ষা করবার মতো অবস্থায় রইল না। অর্থাৎ, যাকে সাহিত্যে বাস্তববাদ Realism, বলা হয় তা তার বিভীষিকা আর আকর্ষণ দুইই নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠল শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই।—বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের গুরু শরৎচন্দ্র এত বড় সম্মান বা দুর্নাম যে সত্যই তাঁর প্রাপ্য নয়, এর সত্যকার গুরু বরং কাল—এ বিষয়ে আজ আমরা অনেকখানি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমাদের দেশে বাস্তববাদের ব্যাপক প্রচলনের ব্যাপারে কালের এক বড় বাহন হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র তা স্বীকার না করেও উপায় নেই।

শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কালের সূচনা থেকে একাল পর্যন্ত অন্যূন ষাট জন সাহিত্যক বাংলা ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখে কম বা বেশি খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা সবাই অবশ্য বাস্তববাদ বলতে যা বোঝায় সেই পথের পথিক নন। তবে শরৎ-উত্তর যুগের পুরোপুরি পরিচয় নিতে হলে এঁদের প্রায় সবারই পরিচয় নেওয়া দরকার। কিন্তু সে-কাজটি দুঃসাধ্য—এত শীগগির হয়ত অপ্রয়োজনীয়ও। আমরা চেষ্টা করব শরৎ-উত্তর কালের বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধানত বাস্তববাদী অংশের যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য একটা ধারণা দিতে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কালেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বাস্তববাদী রচনা বলতে যা বোঝায় তাঁর রচনা ঠিক তা নয়। তাঁর কোনো কোনো রচনায় অনুকূল দৈবযোগের প্রাচুর্য দেখে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাকে বলেছেন বয়স্কদের রূপকথা। কিন্তু আসলে মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর কম ছিল না, আর চরিত্রাঙ্কনে তাঁর রেখাপাতও অনেক সময়ে সুতীক্ষ্ণ হয়েছে। তবে মোটের উপরে জীবনের বাস্তব দিকের কিছু কিছু ইংগিত দিয়ে তিনি পাঠকের হাসি-তামাসার প্রচুর খোরাক জোগাতেই তৎপর হয়েছিলেন।

তাঁর অনেকগুলো ছোট গল্প আজো পাঠকদের প্রিয়।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রভাতকুমারকে বাস্তববাদী না বলা গেলেও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কিছু পরেই উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির অধিকারী হলেন সেই ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সেদিনে বাস্তববাদী রূপেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর 'অগ্নি-সংস্কার' 'শুভা' 'পাপের ছাপ' এবং আরো বহু উসন্যাস সে সময়ে পাঠকসমাজে গৃহীত হয়েছিল পুরোপুরি বাস্তববাদী উপন্যাস রূপে।

কিন্তু তাঁর খ্যাতি অল্পদিনেই ম্লান হয়ে গেছে। তার কারণ মনে হয়, বাস্তবের সত্যকার ছবি তাঁর রচনায় কমই আঁকা হয়েছিল, আর তাঁর চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল আরো কম। কিছু নতুন চিন্তার পরিচয় তিনি অবশ্য দিয়েছিলেন! কিন্তু চিন্তা, শুধু নূতনত্ব বা বৈচিত্র্যের গুণে নয়, গভীরভাবে জীবনধর্মী হলে তবেই মানুষের সমাদর পায়।

কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের একখানি বই 'আমি ছিলাম' তাঁর একটি স্মরণীয় রচনা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। তাঁর 'রবীন মাস্টার'ও কারো কারো শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। কিন্তু রবীন মাস্টারের চরিত্র শেষের দিকে ভাবালু হয়ে পড়েছে বেশি। 'আমি ছিলাম'-এ তাঁর রেখাপাত সে তুলনায় অনেক তীক্ষ্ণ। বইটির বৃদ্ধ নায়ক তাঁর পৌত্রের ভিতরে মানুষের জন্য দরদ আর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস প্রত্যক্ষ করে' নিজের জরাজীর্ণ জীবনে তাঁর অতীত দিনের ব্যাপক-মানবকল্যাণ-অভিমুখী চিন্তার উদ্দীপনা নতুন করে' অনুভব করছেন; পরিবর্তিত কাল সম্বন্ধে এবং সেই পরিবর্তিত কালে নিজের করণীয় সম্বন্ধে বৃদ্ধের চেতনাও পাঠকদের মনে দাগ কাটে।

কল্লোল-গোষ্ঠী

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে যে বাস্তববাদী লিখিয়েদের আবির্ভাব ঘটে সেই সময়ে তাঁদের সাহিত্য-প্রচেষ্টার নামকরণ হয়েছিল অতিআধুনিক সাহিত্য। একালে এই দলের লেখকেরা সাধারণত 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র সাহিত্যিক নামে পরিচিত, যদিও সেইদিনে 'কল্লোল'ই তাঁদের একমাত্র বা মুখ্য মুখপত্র ছিল না। এই দলে অনেক লেখকই ভিড়েছিলেন। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল-যুগ' গ্রন্থে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু কালে কালে গল্প ও উপন্যাস লিখিয়ে হিসাবে এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর বুদ্ধদেব বসু। বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে এঁরা, অথবা এঁদের শেষোক্ত দুইজন, বাংলা সাহিত্যের একালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে বিচার করে' দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায়,

অল্প বয়সে অনেকটা তারুণ্যের উদ্দীপনায় আর ফ্রয়েড, ডি. এইচ্. লরেন্স প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের প্রভাবে এঁরা বাস্তববাদ সম্বন্ধে মুখর হয়েছিলেন। কিন্তু অপরিণত চিত্তশক্তি নিয়ে এঁরা যে বাস্তববাদের জগতে প্রবেশ করেছিলেন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এঁদের সেই দুর্বলতার পরিচয়ই এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য বহন করেছে। এঁরা এবং এঁদের সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রধানত কবি; তাই এঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নিতে হলে এঁদের কাব্য-প্রচেষ্টার দিকে তাকানো বিশেষ দরকার। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে এঁদের রচিত গল্প ও উপন্যাসের দিকেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে জ্ঞান করা যেতে পারে এই দলের Friend, Philosopher and Guide—বন্ধু, দার্শনিক আর নেতা। তাঁর আগে এঁরা নতুন পথের ইংগিত পেয়েছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদারের কোনো কোনো কবিতা থেকে আর কবি নজরুল-ইসলামের উদ্দাম ছন্দে। কিন্তু সেই ইংগিত কিছু বিশিষ্ট রূপ নেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায়। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতার এই দুটি চরণ সুবিখ্যাত:

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটেমজুরের, আমি কবি যত ইতরের।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবযৌবনের রচনা 'পাঁক' উপন্যাসখানিও 'ইতর জীবনে'র কিছু চিত্র এঁদের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু 'ইতর জীবনে'র সঙ্গে এঁদের নিজেদের পরিচয় ছিল যৎসামান্য, আর বিশেষ করে' মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঝোড়ো হাওয়ার দোলাই এঁদের লেগেছিল বেশী। এঁদের অনেকের রচনা সেই দোলার স্নায়ু-চাঞ্চল্যের হর্ষ যেন কাটিয়ে উঠতে চায়নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবি-

গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাবা হয়নি। এক হিসাবে কাজটি সঙ্গতই হয়েছে, কেননা, সমস্ত নূতনত্ব সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্তরঙ্গ যোগ রবীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে, আর রবীন্দ্রোত্তর যুগে আধুনিক কবি নামে যাঁরা পরিচিত তাঁদের চাইতে দেশের জীবন-ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও অনেক গভীর ও ব্যাপক।

কিন্তু তাঁর কবিতা ও উপন্যাস যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হলেও তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে তাঁর ছোট গল্পগুলোয়—তাদের সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়। তাঁর গভীর সৌন্দর্যবোধ ও জীবন-বোধ সে-সবে মাঝে মাঝে অপূর্ব ভাষা পেয়েছে—আমাদের একালের জীবনে সৌন্দর্য ও সার্থকতা কত রকমে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তার ছবি বিচিত্র ভঙ্গিতে সে-সবে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন প্রেমেন্দ্র মিত্রের লাভ হয়েছে, বোধ হয় অনেকেরই এই মত।

তাঁর 'আগামীকাল' থেকে আমরা একটি ছোট অংশ উদ্ধৃত করছি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ও রচনার নিদর্শন হিসাবে ঃ

> এ সহরতলীর দেবতা,—জীর্ণ নির্জীব ভব্যতা। সে দেবতা নিজের মুখ নিজে সাহস করে দেখে না, অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে ভিড়ের তালে পা ফেলে চলার বৃথা চেষ্টায় পদে পদে হোঁচট খায়। বড় নয়—ছোট-খাটো মিথ্যার বোঝায় দিন তার দুর্বহ হয়ে ওঠে। সুবোধ বাবুর বালিকায হয়নি বাইরে। না হোক, ভিতরে চুণকাম আছে। ছোট্ট দোর, দু'জনার বেশী তিনজনার বসবার জায়গা না কুলোয়, বাইরে ঘর আছে একটি। নতুন পালিশ-করা পুরোনো নিলামে-কেনা টেবিল, হাতভাঙা চেয়ার দু'খানা কোনো রকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে' আছে। দেওয়ালময় অবর্তমান বর্তমান বহু বৎসরের ক্যালেণ্ডারের ছবি।

মানুষ সহর তৈরী করে।

সহর সুবোধবাবুদের তৈরি করে শোধ নেয় কি ?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে ভাষাশক্তি ও জীবনবোধ তার মহত্তর পরিণতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে তাঁর কিছু-বেশি রোমান্টিক প্রবণতা। তাঁর একটি গল্পের এই কটি ছত্র বিচার করে' দেখলে সহৃদয়রা হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হবেন :

> এযুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।
>
> এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি তপস্যা আমরা করতে পারি? তপস্যায় বিশ্বাসও আমরা হারিয়েছি। শুধু একদিন সুব্রতের মতো দৈবের অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুচ্ছটায় এইটুকুই আমাদের আশা।
>
> সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ কি আসে না কখনো।

কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের চাইতেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের মর্যাদা বেশি দেন। তাঁদের কথা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা মাঝে মাঝে অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাঁর কিছু-বেশি রোমান্টিক প্রবণতা তাঁর প্রতিভাকে সত্যই কিছু ক্ষুণ্ণ করেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেইদিনে কিছু কবিতা ছোট গল্প ও উপন্যাস, বিশেষ করে' তাঁর 'বেদে' উপন্যাসখানি লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কিন্তু একালে তাঁর

অনেকগুলো লেখা পড়ে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা খুশী হতে পারিনি। তাঁর বাস্তব-বোধ মনে হয়েছে অদ্ভুত। প্রকৃতি-বর্ণনা মাঝে মাঝে তাঁর রচনায় চিত্তাকর্ষক হয়েছে—বিশেষ করে' ভাঙনধরা নদীর বর্ণনা ; কিন্তু মানুষের ছবি তিনি যা এঁকেছেন তা অর্থপূর্ণ হয়নি—সেগুলোকে যদি stunt অর্থাৎ কসরত জাতীয় রচনা বলা যায় তবে নিন্দা করা হয়না। তাঁর 'বেদে'-র একটি ছোট অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

> অগোচরে গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ লাগে, ধূমকেতু তার পুচ্ছ ছোঁয়ায় ! বাসুকী ঠাট্টা করে' গা মোড়া দিলে লজ্জিতা মাটি হয়রাণ হয়ে ওঠে। সাদা মানুষ আর কালো মানুষ পরস্পরের টুঁটি আঁকড়ে কামড়াকামড়ি করে, শেষকালে দুজনার লাল রক্তে রক্তে কোলাকুলি হয়। রাজা সমস্ত দেশে আগুন লাগিয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, মা সহরের গলিতে আঁচলের তলায় নিয়ে মেয়ে ফিরি করে বেড়ায়। সাহারা হাহাকার করে—মোড়লের সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে গর্জমানা ভৈরবী নদী তার গাত্রবাস উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বেদে' সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য অনেক করেছিলেন ; কিন্তু ভাল যতটা বলেছিলেন তাও কম নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন কিছু আশার সম্বল তাঁর এই লেখাটি নতুন করে' পড়ে আমরা পাইনি ; জীবনের প্রতি যে দরদ ও দায়িত্ববোধ লেখাকে অর্থপূর্ণ করে, মনে হয়েছে, কেমন করে' যেন তারই অভাব ঘটেছে তাঁর রচনায়। তাঁর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য লেখা বোধ হয় তাঁর 'যতন বিবি'। তাতে চরিত্রগুলোকে খুব বাস্তব করতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তারা দাঁড়িয়েছে যেন বাস্তবের মুখোস পরে—তাদের আন্তরাত্মার স্পর্শ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু অল্প বয়সেই সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন আর নব-যৌবনেই পদ্য গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, নাটক, প্রবন্ধ, শিশু-সাহিত্য, এমন বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, এবং আজো রচনা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেরণা পেয়েই তিনি সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন, কিন্তু অচিরে ফ্রয়েড্ এবং ডি. এইচ. লরেন্সের প্রভাব তাঁর উপরে প্রবল হয়। তিনি একজন বহুশ্রুত সাহিত্যিক, ইয়োরোপের অনেক সাহিত্যিকেরই প্রভাব কালে কালে তাঁর উপরে পড়েছে।

অল্প বয়সেই তিনি যেমন খ্যাতিমান হন তেমনি নিন্দার পাত্রও হন। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর মতো অত কড়া নিন্দা বোধ হয় আর কাউকে ভোগ করতে হয়নি। সেটি অবশ্য এক হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক শক্তিরই পরিচায়ক।

তাঁর সাহিত্যিক প্রচেষ্টা অনেক বাঁক-বন্দর ঘুরে এসেছে, অনেক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই অল্প কথায় তাঁর পরিচয় দেওয়া কঠিন। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কবিতা রচনায়ই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বেশি। তাঁর প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনীও অনেকের প্রিয়। কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কম।

তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে মাত্র 'তিথিডোর' পড়ে আমরা অনেকখানি খুশী হতে পেরেছি। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শ্রেণীতে এটিকে ফেলার কথা ভাবা যায় না। তার কারণ, কোনো শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা, জীবনের তেমন অর্থপূর্ণ কোনো চিত্র, এতে ফুটে ওঠেনি। একটি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ চিত্র এতে দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। তাই এটি হয়েছে আমাদের একালের নাগরিক বা ভদ্র বাঙালী জীবনের একটি অজটিল উপভোগ্য আলেখ্য—কিন্তু

তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এই বইটি সম্বন্ধে আরো একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যে-সব চিন্তা বা বর্ণনার জন্য লেখককে অনেক নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে তার কিছুই তাঁর এই বইখানিতে স্থান পায়নি।

তাঁর এই বইখানি আর তাঁর উপভোগ্য ভ্রমণকাহিনীগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে যদি বলা যায় যে বুদ্ধদেব বসুর সত্যকার বিষয় প্রতিদিনের অজটিল আনন্দোজ্জ্বল জীবন—জটিল জীবন তাঁর বিষয় নয়—তবে বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে খুব ভুল করা হয় না।

তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পেও বর্ণনার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে —মাঝে মাঝে দুই একটি উক্তি বেশ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সমগ্রতার দিক দিয়ে তাঁর বহু রচনাই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে। সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে অনেকখানি উগ্রভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক ধারণা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এমন অনর্থ ঘটিয়েছে, বারবার এ ধারণা আমাদের হয়েছে।

তাঁর রচনা থেকে আমরা কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। সে-সবে একই সঙ্গে পাওয়া যাবে তাঁর কথার ঔজ্জ্বল্য আর তাঁর চিন্তার ত্রুটিপূর্ণ প্রবণতা ঃ

> মুক্তি দাও, আত্মচেতনার এই পাষাণ-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি দাও আমাকে। জানবার আর বোঝবার আর তর্ক করবার আর যুদ্ধ করবার এই সর্বনেশে, আত্মঘাতী নেশা থেকে মুক্তি দাও।
>
> ....
>
> আঃ! যদি এই আত্মচেতনার বিষ নিংড়ে নিঃশেষে বার করে দিতে পারতাম তবে আত্মার সেই শূন্য পেয়ালা ভরে উঠতে পারতো অভাবনীয় অতুলনীয় ঐশ্বর্যে! তাতেই পূর্ণতা ঃ নিশ্চেতন; স্বত-উৎসারিত সেই স্রোতে চিরকাল নতুন হয়ে উঠছে, চিরকাল ধরে ঠেলে উঠছে অন্ধকারের রহস্য-উৎস

থেকে। কোনো ভাবনার দরকার করে না; বুঝি তাকে হারালাম এই ভয়ে মরে থাকতে হয় না। সেখানে শান্তি। আমাদের সমস্ত কামনার ব্যর্থতা আর নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার যন্ত্রণা, বিশ্বের দর্পণে নিজের সহস্র মূর্তি দেখার দুঃস্বপ্নের পরে যে শান্তি আসে।

... ...

স্পন্দন? এই একটা জিনিসকে সত্য বলে জেনেছি আমি, যৌবনের প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত আমি চেয়েছি— আর কিছু নয়—স্পন্দিত হতে, স্পন্দিত হতে। ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় খ্যাতি দুঃখ কিছুই কিছু না—একমাত্র যাতে এসে যায় জীবনে তা—হৃদয়-স্পন্দন, স্নায়ুর কম্পন, রক্তের চঞ্চলতা। ও রকম মুহূর্ত কটা আসে জীবনে আর পাবার শক্তিই বা থাকে ক'জনের। বিরল বিমল সে সব মুহূর্ত। ওই সব মুহূর্তগুলোতেই সত্যিকার বাঁচি আমরা।

(শেষ পাণ্ডুলিপি)

তাঁর এই অ-সাধারণ আত্মকেন্দ্রিক দর্শন খুব স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে তাঁর কবিতার এই ছত্রগুলোয়ঃ

বিতর্ক-বিরুদ্ধ মন দ্বিখণ্ডিত দর্পণের মতো
বিড়ম্বিত প্রতিবিম্বে, রাষ্ট্র করে বিশ্বের বিকৃতি,
পরস্পরে হত্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তির সেনানী।
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত,
সঙ্ঘহীন সংজ্ঞাহীন এককের আদিম জ্যামিতি—
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর যে সব রচনায় বাস্তববোধের পরিচয় বেশ চোখে পড়বার মতো করে দিতে চেষ্টা করেছেন সে সবের অধিকাংশই তাঁর প্রথম জীবনের রচনা, আর রচনা হিসাবে সেগুলো যে অপরিণত তা সহজেই বোঝা যায়। ফ্রয়েডে ও ডি.

এইচ. লরেন্সে বাস্তববোধের পরিচয় ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েও ব্যাপক-জীবন-মুখী হননি, হয়েছেন মুখ্যত আত্ম-কেন্দ্রিক। জীবনে আত্ম-কেন্দ্রিকতার দাম দেওয়া হয় না ; কিন্তু সাহিত্যে কখনো কখনো দেওয়া হয়, কেননা, সাহিত্যে সচেতনতাকে খুব মূল্যবান জ্ঞান করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিকতা সাহিত্যেও ভাল ফসল ফলায় না। প্রেম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর এই বিখ্যাত কটি লাইনের কথা ভাবা যাক :

> যে-প্রণয়
> বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
> মৃত্যু নেই তার।

যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য রয়েছে এই কথাগুলোয়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এ অগভীর কথা। যে 'বিবসন বিশুদ্ধ জান্তব' প্রণয়ের কথা বলা হল তা মানুষে ও পশুতে অবিশেষ—মৃত্যুহীনও বটে। কিন্তু বিশেষ মানবিক সম্পদ নেই বলে তা স্বল্প-মূল্যই। অন্তত, মানুষের যুগ-যুগান্তরের শ্রেষ্ঠ কাব্যে যে-প্রণয়ের কথা বলা হয়েছে তা 'বিবসন বিশুদ্ধ জান্তব' প্রণয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন না হয়েও কিছু স্বতন্ত্র। ডি. এইচ. লরেন্স অবশ্য 'বিবসন বিশুদ্ধ জান্তব' প্রেমের ভক্ত, কিন্তু সেই প্রেমে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কিছুও তিনি পেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর মনটি ডাইনে বাঁয়ে যেন কম তাকায়।

তেমনি তাঁর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' থেকে উপরে যে কথাগুলো তোলা হয়েছে তাকেও দুর্বল চিন্তা না বলে উপায় নেই। মাত্র stunt হিসাবেই এমন কথা বলা চলে ; কিন্তু stunt তো ক্ষণজীবি। 'শেষ পাণ্ডুলিপি' বুদ্ধদেব বসুর একালের রচনা। তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তি, ভাষা-সামর্থ্য, এসবের পরিচয় এতে কম নেই, কিন্তু তাঁর বক্তব্য অকিঞ্চিৎকর—অকিঞ্চিৎকর ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না

কেন না তিনি এঁকেছেন বিকৃত অহমিকার একটা জীবন-বিমুখ খেয়ালী ছবি—বক্তব্য অকিঞ্চিৎকর হলে, অর্থাৎ জীবন-ক্ষেত্র থেকে পলাতক ও খেয়ালী হলে, তা থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ফল লাভ হয় না তা উৎকট Art for art's sake-বাদী বন্ধুরা যত বাগ্‌-বিস্তারই করুন।

বুদ্ধদেব বসুর খুব একালের দু'একটি প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছে জীবনের মহত্তর পরিণতির কথা তিনি ভাবছেন।

একালের বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরাই বাস্তববাদ নিয়ে বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছিলেন—সেই বিতর্কের কোলাহল দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছড়িয়েও পড়েছিল। কিন্তু আমরা এই গোষ্ঠীর নেতাদের যতটা পরিচয় পেলাম তা থেকে বোঝা গেল কল্লোল-গোষ্ঠীর বাস্তববাদ ছিল খুব অবিকশিত—আমাদের সাহিত্যে তা থেকে স্মরণীয় কিছু পাওয়া সম্ভবপর ছিল না, পাওয়া যায়ও নি। এর পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বাস্তব-বোধের—অর্থাৎ রূঢ় বাস্তব-বোধের—কিছু উল্লেখযোগ্য পরিণতি আমরা দেখব।

'কল্লোল-গোষ্ঠী'র ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। সেই মূল্য সম্পর্কে গ্যেটে ও একেরমানের কথোপকথনের এই অংশটি প্রণিধানযোগ্য :

গ্যেটে—...এই যে কাব্য-বিপ্লবের (ফরাসী রোমান্টিক কবিদের) সূচনা মাত্র হয়েছে, এর ফল সাহিত্যের জন্য হবে খুব শুভ কিন্তু বিপ্লব-কর্তা সাহিত্যিকদের জন্য একান্ত ক্ষতিকর।

একেরমান—যাতে প্রতিভার ক্ষতি হয় তা দিয়ে সাধারণভাবে সাহিত্যের উপকার হবে কেমন করে'?

গ্যেটে—এই সব বাড়াবাড়ি কালে যাবে দূর হয়ে কিন্তু রয়ে যাবে এই সব ভাল ফল : শুধু বাহ্য রূপের অদল-বদল নয় তার

সঙ্গে সঙ্গে আসবে বিষয়ের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য, বিরাট বিশ্ব জগতের ও অশেষবৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কিছুই আর কাব্য-কলার অযোগ্য বিষয় জ্ঞান করা হবে না। এই সাহিত্যিক যুগকে আমি তুলনা করি খুব কড়া জ্বর-ভোগের সঙ্গে; সে-জ্বর কাম্য নয় কারো, কিন্তু তার একটি ভাল ফল এই যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এখন বীভৎসতাই কাব্যের গোটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এটি হবে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ মাত্র, শুধু তাই নয়, যে পবিত্র ও মহৎ ভাব এখন বর্জিত হয়েছে অচিরে বাড়বে তার সমাদর।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলে লিখতেন। কিন্তু তাঁকে 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র লেখক না বলাই সঙ্গত, কেন না, বাস্তবতা নিয়ে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা মাতামাতি তিনি কখনো করেন নি যদিও তাঁর বাস্তবের বোধ গভীর। দেশের সঙ্গে তাঁর যোগও নিবিড়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই:

> শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্রজীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই।...তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজেই ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারিপাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।

শুধু দারিদ্র্য নয় গ্রামের বিচিত্র কদাচারের ছবি, আর বিশেষ করে' নারী-নির্যাতনের-ছবি, তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁকে জ্ঞান করা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের একজন সত্যকার উত্তর-সাধক। তাঁর বাস্তবতার

চিত্রণে কৃত্রিমতা নেই একথা বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের উচ্চ মর্যাদার ইংগিত করেছেন।

কিন্তু বাস্তব-বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতে রোমান্টিক চেতনাও বেশ আছে। তার পরিচয় ফুটেছে সাঁওতাল জীবনের যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে। তাঁর সেই সব গল্প খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই শ্রেণীর লোকদের জীবনের ছবি আঁকায় পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সাঁওতাল জীবন সম্বন্ধে শৈলজানন্দ যে সব গল্প লিখেছেন সেগুলো পড়ে আমাদের মনে হয়েছে রোমান্টিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে আর একটু কম থাকলে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা-বোধ হয়ত আরো উচ্চতর সার্থকতা লাভ করত।

শৈলজানন্দের সৃষ্টিধর্মী কল্পনা কিছু নিস্তেজ হয়ে পড়ে অল্পদিনেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোমান্টিক প্রবণতা আমাদের একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবল তা বাস্তববাদের যতই ভক্ত তাঁরা হোন—তার পরিচয় পাওয়া গেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলা যায় না, কিন্তু তাঁর মধ্যে রোমান্টিক প্রবণতা একটা নতুন ফল ফলিয়েছে। তাঁর অতিপ্রবল প্রকৃতি-প্রেমের তা হয়েছে অনুবর্তী —পেছনে থেকে নানাভাবে সরসতা যুগিয়ে চলার ভূমিকা তা নিয়েছে, সামনে এসে অদ্ভুত হয়নি। আমাদের একালের অনেক বাস্তববাদী রোমান্টিক চেতনার এই বৈধ ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারেন নি।

প্রকৃতি বিভূতিভূষণের চিন্তায় ও অনুভবে এক অতিবড় সত্য। সাধারণত উপন্যাসে তেমন মনোভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না; তার কারণ, উপন্যাসের মুখ্য বিষয় প্রতিদিনের জীবন—প্রকৃতি তার

পটভূমিকা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার অতিরিক্ত নয়। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতি পটভূমিকার চাইতে আরো অনেক বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনাড়ম্বর দৈনন্দিন জীবনের প্রতি বিভূতিভূষণের গভীর মমতাও তাঁর চেতনায় কখনো আবৃত হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক তিনি হতে পেরেছেন এরই গুণে।

বিভূতিভূষণের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এই অভিযোগ করেছেন যে তাঁর স্বষ্ট নায়ক-নায়িকারা কৈশোর অতিক্রম করে বয়স্ক আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এ অভিযোগ যথার্থ নয়। কালক্রমে তাঁর চরিত্রগুলোর বিকাশও ঠিকই ঘটেছে, তবে প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে এতখানি সম্পদ জীবনে তারা লাভ করেছে যে তার ফলে কামনা বাসনা বা লোভের দিকটা তাদের মধ্যে প্রবল হতে পারে নি; তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসে নায়ক ভবানী বাঁড়ুয্যে সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

> তিনি গুরুর আশ্রয় পেয়েও ছেড়েছেন ঠিক, সন্ন্যাসী না হয়ে গৃহস্থ হয়েছেন, তিনটি স্ত্রী বিবাহ করে জড়িয়ে পড়েছিলেন একথাও ঠিক—কিন্তু তাতেই বা কি ? মাঠনদী বনঝোপ, ঋতুচক্র, পাখী, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রির প্রহরগুলির আনন্দবার্তা তাঁর মনে এক নতুন উপনিষদ রচনা করেছে। এইখানে তাঁর জীবনের সার্থকতা।

এরূপ চরিত্র অন্তত আমাদের দেশে অবাস্তব নয়। আর সাধারণভাবে বলা যায়, এমন সব চরিত্র খুব স্বাভাবিক না হলেও মানুষের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার ক্ষমতা এদের কম নয়। একালের ইংরেজ কথা-সাহিত্যিক সমারসেট মম্ তাঁর সুবিখ্যাত Razor's Edge-এ এই ধরনের একটি চরিত্র এঁকেছেন।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেম তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এক অকৃত্রিম মরমী চেতনায়। সেই মরমী চেতনা থেকে কিছু অবাঞ্ছিত

প্রবণতাও তাঁতে দেখা দিয়েছে—প্রেতাত্মা ও প্রেতলোক সম্পর্কে তাঁর প্রবল কৌতূহলের দিকে আমরা ইংগিত করছি—কিন্তু তাঁর সেই দুর্বল দিক বাদ দিয়ে বলা যায়, প্রকৃতি-প্রেম ও তার আনুষঙ্গিক মরমী চেতনা তাঁর রচনায়, বিশেষ করে' তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে ও 'আরণ্যকে' এক উচ্চ মানবিক সম্পদ হয়ে উঠেছে—বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে তা সম্পর্কহীন তো নয়ই বরং তা গভীর ভাবে সম্বদ্ধ, জীবনকে তা অনুভব-সমৃদ্ধ করেছে। যা সাধারণত বাস্তব নামে পরিচিত মানুষের জীবনের জন্য শুধু তাইই বাস্তব নয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিদিনের আনন্দোজ্জ্বল জীবন যে বিভূতি-ভূষণকে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বিশেষ প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে, এই মনে হয়। কিন্তু প্রেরণালাভ তাঁর যেখান থেকেই হোক তাঁর প্রকৃতিবোধ আর মরমীবোধ অকৃত্রিম ও গভীর। এই বোধ তাঁর সাহিত্যকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে।

তাঁর রচনার চিত্ররূপ বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সে-রূপে তাঁর প্রতিভা পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশ পায় নি—প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব বোধ আর তাঁর মরমী চেতনা তাতে কমই ব্যক্ত হয়েছে। হয়ত তা ব্যক্ত করা কঠিন সেই জন্যই।

বিভূতিভূষণ কিছু ভাল ছোট গল্পও লিখেছেন। তাঁর গভীর স্নেহময় প্রকৃতি ও প্রকৃতি-প্রেম সে সবে খুব হৃদ্য রূপ পেয়েছে।

তার নিজস্ব জগৎ নিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্য শরৎ-উত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে বিভূতিভূষণকে শরৎ-উত্তর না বলে রবীন্দ্রোত্তর বলাই ভাল।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্করের জন্ম উড়িষ্যায়। সেখানে তাঁদের পরিবারের দীর্ঘকালের বসতি। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে উড়িষ্যায়। তিনি

ওড়িয়াতে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তাঁর হাতে পড়ে 'সবুজ পত্র' ও রবীন্দ্রনাথের রচনা। তার ফলে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ওড়িয়া ছেড়ে তিনি বাংলায় মন দেন।

সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে তাঁর নতুন চেতনা লাভের কথা তাঁর 'বিনুর বই' রচনাটিতে মনোরম করে' বলা হয়েছে। তাতে দেখা যায় সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে অল্প বয়সেই বহু কথা তিনি ভেবেছিলেন। বোধ হয় তার বড় কারণ, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, রোমাঁ রোলাঁ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ একালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের রচনার সঙ্গে তিনি অল্প বয়সেই পরিচিত হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে একটি বড় স্বপ্ন নিয়ে অন্নদাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেছেন।

তাঁর অল্প বয়সের লেখা 'পথে প্রবাসে' তাঁকে ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী করে।

অন্নদাশঙ্কর যেমন সচেতন একালের দাবি সম্বন্ধে তেমনি সচেতন ভারতের ঐতিহ্যের দাবি সম্বন্ধেও। তাঁর উড়িষ্যায় জন্ম ও লালন তাঁর এই প্রাচীন-ঐতিহ্য-চেতনার মূলে হয়ত অনেকখানি।

কিন্তু সাহিত্যে, বিশেষ করে' রসসাহিত্যে, সচেতনতা একই সঙ্গে গুণের ও দোষের। অন্নদাশঙ্করের সাহিত্য-প্রচেষ্টায় সেই গুণ ও দোষ দুইয়েরই সাক্ষাৎকার আমরা পাই।

একখানি মহা উপন্যাস লিখবার সংকল্প তিনি করেন নব-যৌবনেই। অচিরে তিনি তাতে হাত দেন। আর দশ বৎসরে ছয় খণ্ডে এটি লিখে শেষ করেন। এর নাম তিনি দেন 'সত্যাসত্য'। 'সত্যাসত্য' ভিন্ন আরো যে সব রচনায় তিনি হাত দেন তাও পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে কম নয়। ছোট গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, ছড়া এমন বহু ক্ষেত্রেই তিনি লেখনী পরিচালনা করেছেন।

অন্নদাশঙ্কর 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র লেখক নন ; কিন্তু সেই গোষ্ঠীর অনেকে তাঁর বন্ধুস্থানীয়। বোধহয় সেই জন্য কল্লোলের বাস্তব-বাদের ছোঁয়াচ তিনি একেবারে এড়াতে পরেন নি—তাঁর দুটি দুর্বল রচনায় ('আগুন নিয়ে খেলা' ও 'পুতুল নিয়ে খেলা'য়) রয়েছে সেই পরিচয়। কিন্তু 'কল্লোর গোষ্ঠী'র লেখকদের চাইতে তাঁর জীবন-বোধ ও দেশের সঙ্গে যোগ অনেক গভীর। অল্প দিনেই তার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

তাঁর প্রবন্ধগুলো যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে, বিশেষ করে' প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে। বীরবলের তিনি একজন যোগ্য উত্তর-সাধক।

তাঁর ছোট গল্পের বই 'মন-পবন', ছোট উপন্যাস 'না' ও 'কন্যা'ও অনেকের প্রিয় হয়েছে। এক সময়ে আমাদের ধারণা হয়েছিল তাঁর 'মন-পবন'ই এ পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ রেখায় তাঁর চরিত্র চিত্রণের ক্ষমতা তাতে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পরে আমাদের ধারণা হয়েছে "সত্যাসত্য'ই এ পর্যন্ত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা—একালের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি এটি। কিছুদিন পূর্বে 'রত্ন ও শ্রীমতী' নাম দিয়ে তিনি আর একখানি দীর্ঘ উপন্যাস আরম্ভ করেছিলেন। তাতে প্রেম সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উপলব্ধিকে রূপ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়। কিন্তু শোনা যায় সেই বইখানি লেখায় তিনি আর এগোবেন না। কেন তা অবশ্য তিনিই জানেন ভাল। তবে তাঁর 'বিনুর বই'তে প্রেম সম্বন্ধে তাঁর নতুন উপলব্ধির যে সব ইংগিত তিনি দিয়েছেন সে সবকে পূর্ণাঙ্গ রূপ না দিলে হয়ত তিনি নিজের প্রতি ও তাঁর যুগের প্রতি অবিচার করবেন।

আমরা বলেছি অন্নদাশঙ্কর যথেষ্ট সচেতন সাহিত্যিক, আর সাহিত্যে সচেতনতা একই সঙ্গে গুণের ও দোষের। 'সত্যাসত্যে' তাঁর সেই গুণ ও দোষ দুয়েরই পরিচয় আমরা পাই। এতে লেখক

চেষ্টা করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে, সে সবের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য এই দুটি : একালের ইয়োরোপের প্রতি আমাদের যে প্রবল অনুরাগ তা আমরা জীবনের পূর্ণ অবলম্বন হিসাবে আঁকড়ে ধরতে পারি কিনা ; আর ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে আমরা কি বুঝব। কিন্তু অত অল্প বয়সে এত বড় বিষয়ের যোগ্য রূপায়ণ তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হবে এ আশা করা যায় না। ঘটেছেও তাই। তাঁর নায়ক বাদল আধুনিক জগতের বিচিত্র আইডিয়ার দ্বারা তাড়িত। ফলে আইডিয়ার ফানুস সে বহু ভাবেই হয়েছে। কিন্তু এত আইডিয়া নিয়ে একজন যোগ্য মানুষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি—আইডিয়ার আকাশে নানা ভঙ্গিতে সঞ্চালিত হতে হতে ফানুসের মতনই এক দিন সে নিভে গেল। বাদলের বন্ধু সুধী ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধানী। বাদলের তুলনায় সে অনেকখানি রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু সেই ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধানই সে করে' চলেছে। তার জন্য অনেক স্নেহ-মমতার বন্ধন সে অস্বীকার করলে। কিন্তু তার অভীষ্টের সন্ধান কিছু সে পেলে কিনা তা বোঝা গেল না। তবে এই সব মূল বিষয়ে তেমন সার্থক না হলেও বিচিত্র ধরনের নরনারীকে এই বইতে তিনি আমাদের সামনে হাজির করতে পেরেছেন। তাদের কেউ কেউ অদ্ভুত ভাবে হাস্যকর, কেউ নির্বোধভাবে সুখী, কেউ দুঃখে ম্রিয়মাণ, কেউ জীবনের কাঁটা-ভরা-ডালে ফুলের মতো সরস, কেউ দোষে গুণে মিলিয়ে বিশিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। এত বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টি আমাদের একালের সাহিত্যিকরা কমই করতে পেরেছেন।

কিন্তু মনে হয় এই চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা এর পরে আমরা উল্লেখ-যোগ্য ভাবে পাই মাত্র তাঁর 'মন-পবনে'। তার পরে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা তিনি যেন আর তেমন দেখাতে পারছেন না। কিন্তু চিন্তার দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা আজো তাঁতে রয়েছে। অনুভূতি অন্নদাশঙ্করে

কম প্রবল নয়। কিন্তু তারও উপরে উঁচিয়ে আছে তাঁর চিন্তা। তাতে অনুভূতি যেন নিজেকে মেলে দেবার জায়গা পাচ্ছে না।

আমাদের একালের চিন্তার দৈন্যের যুগে, অর্থাৎ জীবনধর্মী চিন্তার দৈন্যের যুগে, জীবন-জিজ্ঞাসুরূপে অন্নদাশঙ্কর আরো কিছু জাতিকে দিতে পারবেন আশা করা যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অল্প বয়সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় দেন। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' পড়ে অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হয়ে ওঠেন। কালে কালে তিনি অনেক উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করেন ; কিন্তু সে সবের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছোট গল্প আর মাত্র দুটি উপন্যাস পাঠকদের সেই আশা কিছু পরিমাণে পুরন করেছে। তাঁর অবশিষ্ট রচনায়—তার পরিমাণ যে কম নয় তা বলা হয়েছে—তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তির আর দেশের জীবনের সঙ্গে, বিশেষ করে' তার দুঃস্থ অংশের সঙ্গে, তাঁর অন্তরঙ্গ যোগের পরিচয় থাকলেও অর্থপূর্ণ সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে সে সব কমই উৎরেছে।

'কল্লোল-গোষ্ঠী'র লেখকদের বাস্তব-বোধের অপরিণতি ও অদ্ভুতত্বের কথা আমরা বলেছি। তাঁদের ধারার বাইরে শৈলজা-নন্দের রচনায় সামাজিক বাস্তব-বোধের উল্লেখযোগ্য পরিচয় আমরা পাই, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে বাস্তব বাদ বলতে যে রূঢ়, সাধারণত সমাজ-ধর্ম-বিরোধী, বাস্তবের রূপায়ণ বোঝায় তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হয় মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রচনায়ই। তাঁর যে দুটি সার্থক উপন্যাসের কথা আমরা বলেছি সে দুটি হচ্ছে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' আর 'পদ্মা নদীর মাঝি'। আর তাঁর সার্থক গল্পগুলোর মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'সরীসৃপ'।

এক হিসাবে তাঁর সার্থক ছোট গল্পগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি —আমাদের সাহিত্যের এক অসাধারণ সম্পদ। জীবনের কদর্য রূপ আর বিচিত্র রেখায় রেখায় সেই কদর্য জগতের নরনারীদের চিত্রণ, সে-সবে এমন অব্যর্থ হয়েছে যে তাদের সত্যতায় আমরা স্তম্ভিত না হয়ে পারি না। কিন্তু তাঁর এমন সৃষ্টির পরিমাণ দুর্ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত কম।

তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় যে সব নর নারী আঁকা হয়েছে তারা সবাই বাস্তব-ধর্মী। তাদের প্রাত্যহিক জীবন চালিত হয় কোনো আশা বা আদর্শের দ্বারা নয়, প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজন, লোভ, কামনা, চক্রান্ত, এ সবের দ্বারা—তারা এ সবের দ্বারা চালিত পুতুল। তবে এই নির্জলা বাস্তবের মধ্যেও আমরা দেখা পাই প্রেমের—সেই প্রেম আত্মসুখ চায় না, প্রেমাস্পদের সুখে ও সার্থকতায় সুখী ও সার্থক হতে চায়।

'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব চাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস। এতে বিশাল পদ্মায় যারা মাছ ধরে সেই পূর্ববঙ্গের জেলেদের দুঃখ সুখ, আশা কামনা ব্যর্থতা, তাদের বিশেষ ভাষা, সবই যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে একটি দুর্বলতাও বইটিতে লক্ষ্য করা যায়, সেটি হচ্ছে, এদের নেতৃস্থানীয় হোসেন মিয়ার রহস্যময় কথাবার্তা ও চালচলন—জেলেদের কঠোর জীবন চিত্রণের চাইতে বইখানির শেষের দিকে সেই দিকটা বড় হয়ে উঠেছে। এই বই খানির এত জনপ্রিয়তার মূলে এর নামকরণ, মোহিত বাবুর এই অনুমান অনেকখানি স্বীকার্য। তার সঙ্গে পদ্মাপারের জেলেদের মুখের ভাষার আকর্ষণও গণনীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প দিনেই রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে যাকে বামপন্থী চিন্তা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বা কমিউনিজম বলা হয় তা বরণ করেন। তাঁর অনেক রচনা সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই ভাবধারার অনুবর্তী হয়ে শ্রমিকদের

অধিকারের কথা, তাদের প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে তোলার কথা, তিনি যথেষ্ট জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ; লালসার— বিশেষ করে' সঙ্গতিসম্পন্নদের জীবনে—প্রায় অর্থহীন চিত্রও আঁকতে পেরেছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর বেশী আর কিছু করা তাঁর পক্ষে কদাচিৎ সম্ভবপর হয়েছে—তাঁর ভিতরকার অসাধারণ শিল্পী প্রচারণার পর্বতপ্রমাণ বোঝার চাপে যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল।—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর বাস্তব-বোধের মধ্যেও রোমান্টিক প্রবণতা ছিল—তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় ও 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে তার কিছু পরিচয় আমরা পাই —মনে হয়, তাঁর ভিতরকার সেই স্বপ্ন ও সৌন্দর্য-বোধ ক্রূর বাস্তবের সংস্পর্শে এসে এমন ভাবে ভেঙে গিয়েছিল যে মানুষের পর্বত-প্রমাণ নির্বুদ্ধিতা, দুর্বলতা ও নষ্টামি প্রত্যক্ষ করে' তাদের সম্পর্কে কোনো বড় আশা-আনন্দের কথা তিনি আর মনে স্থান দিতে পারেন নি, শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্য কাম্য জ্ঞান করেছিলেন কিছু রুটির বন্দোবস্ত আর কিছু 'আরাম আয়েস'—তাঁর 'শহর-তলী'র নায়িকা যশোদার মুখে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে ঃ

> যশোদার কল্পনার নগর তাই সহররূপী গ্রাম নয়, সহরই বটে। নগরের পথে ট্রাম চলে, পথের দুপাশে পাঁচ সাত তলা বাড়ী থাকে, দোকান থাকে, সিনেমা থাকে, পার্ক থাকে, গলি থাকে, হাজার হাজার মানুষ থাকে, অনেক কিছুই থাকে সহরে। কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে সামঞ্জস্য, বড় বাড়ীর আড়ালে ছোট বাড়ীর ফাঁপর লাগে না, গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা থাকে না, থাকেও নামে....ভাপসা গন্ধ কোন গলিতে, কোন বাড়ীতে পাওয়া যায় না, আর—
>
> সত্যপ্রিয় অবশ্য মোটরে চড়িয়াই বেড়ায় যশোদার নগরে, কিন্তু যশোদা যে কুলী মজুরদের সঙ্গে ঘর করে, তারা পেট

ভরিয়া খাইতে পায়, দরকার মত স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করিবার অবসর পায়,—আর? আর কি পায়?—আর? পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামা কাপড় পরিতে পায়, দরকার মত স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করার মত অবসর পায়...

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন একজন শক্তিধর পুরুষ যাঁর পরিমিত কিন্তু খুব লক্ষণীয় সাফল্য আর বিরাট ব্যর্থতা নিয়ে এক উঁচুদরের আলোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে সব চাইতে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

তাঁর লেখাগুলো তিনটি বড় বিভাগে সাজানো যেতে পারে। প্রথম বিভাগে, রাঢ়ের গ্রাম্য পরিবেশের চিত্র (তিনি বীরভূমের লোক)—সেই পরিবেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রা, আমোদ-আহ্লাদ, তাঁর গভীর অনুরাগ আকর্ষণ করেছে। দ্বিতীয় বিভাগে, উচ্চ বর্ণের লোকদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ক্ষয়শীল দশার চিত্র—সে জন্য তাঁর বেদনা সুগভীর। তৃতীয় বিভাগে, প্রাচীন জীবন-ধারার সঙ্গে আধুনিক জীবন-ধারার সংঘর্ষের চিত্র—দুয়েরই মধ্যে যা ভাল তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

তারাশঙ্কর প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন—তাঁর প্রথম স্তরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনায় গীতি-কবিতার সুর পাওয়া যায়। তাঁর দ্বিতীয় স্তরের লেখা ('ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি) থেকেই তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার সূচনা হয়। আর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তাঁর ঔপন্যাসিক যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠি'তে আঞ্চলিক জীবনের প্রথম অনেকখানি সার্থক ছবি আমরা পাই—তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় সেই আঞ্চলিক চিত্র এক অনন্যসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছে। এ ব্যাপারে ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির সাফল্যের সঙ্গে তাঁর সাফল্য তুলিত হতে পারে। তবে ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্করের দুর্বলতাও লক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্রে আমরা মাঝে মাঝে চরিত্র-সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছি। শরৎচন্দ্রের পরে বড় সার্থক উপন্যাস হচ্ছে বিভূতি-ভূষণের 'পথের পাঁচালী' আর অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'। 'সত্যাসত্যে' অপ্রধান চরিত্রগুলো বেশি সার্থক হয়েছে আর 'পথের পাঁচালী'তে প্রায় সব চরিত্রই মোটের উপর সরল কিন্তু অসার্থক তারা হয়নি পরিবেশের সঙ্গে তাদের গভীর সঙ্গতির ফলে—এ কথা আমরা বলেছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আর ছোট গল্পগুলোয়ও কিছু চরিত্রসৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিদিনের পরিচিত মানুষদের দেখা সে সবে আমরা পাই—এও আমরা নিবেদন করেছি। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনযাত্রার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে সত্যকার বাস্তবধর্মী চরিত্র—শরৎচন্দ্রের ভাষায়, concrete রচনা—তাদের সাক্ষাৎকার আমরা পাই তারাশঙ্করের রচনার মধ্যেই, এই আমাদের একালের সাধারণ সাহিত্যিক ধারণা দাঁড়িয়েছে। এ ধারণার সমর্থনে বলা যায়, অন্তত তাঁর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় তারাশঙ্কর ছিরুপাল, অনিরুদ্ধ, রহম, তিনকড়ি, বনোয়ারী পরম ও করালীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যাদের বাস্তব না ভেবে পারা যায় না। তা ছাড়া এ সমস্ত উপন্যাসে শুধু পাত্র-পাত্রী নয়, পরিবেশও অত্যন্ত জীবন্ত—নদী মাঠ গাছপালা ঋতুর পরিবর্তন, এ সব আমাদের জানিয়ে দিয়ে যায় তারা সত্যই আছে, শুধু বইয়ের বর্ণনা তারা নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও

তারাশঙ্করের মজ্জাগত যে দুর্বলতা সে দিকেও তাকাবার আছে। যে জীবন তাঁর অঙ্কনের বিষয় হয়েছে তা চোখে দেখা জীবন যতখানি স্মৃতি-বাহিত জীবনও যেন ততখানি, আর সে সবের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তনেরও যোগ ঘটেছে। 'পঞ্চগ্রামে'র ন্যায়রত্নের কথা ভাবা যাক। তাঁর পুত্র শশিশেখরও খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত। কিন্তু পিতাকে লুকিয়ে ইংরেজী শিখেছিলেন তিনি, তাঁর ইংরেজী-জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদে ভারতীয় আদর্শের সমর্থনে তিনি যে সব কথা বললেন তাতে—তাঁর মুখে ম্লেচ্ছ ভাষা শুনে ন্যায়রত্ন এতখানি বিচলিত হলেন যে তিনি পুত্রকে বললেন ঃ

> আজ থেকে জানবো আমি পুত্রহীন। সনাতন ধর্মকে যে আঘাত করতে চেষ্টা করে সে ধর্মহীন। ধর্মহীন পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা আর কিছু করণীয়, কল্যাণ আর কিছু কামনা করতে পারি না আমি।

এর ফলে শশিশেখর আত্মহত্যা করলেন।

এ সব লেখকের বর্ণনা অনুসারে ঘটে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এমন ঘটনা যে অসম্ভব সে কথা বলবার মতলব আমাদের নয়, কিন্তু যতখানি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর তাঁর ন্যায়রত্ন চরিত্রটির পানে তাকিয়েছেন একালের একজন সাহিত্যিকের পক্ষে তা অদ্ভুত কেননা ন্যায়রত্ন abnormal অস্বাভাবিক চরিত্র। জনশ্রুতি অনেক অদ্ভুত ব্যাপারকে সুসহ, এমন কি, সৌন্দর্যমণ্ডিত করে—তারাশঙ্করের এই মহাসম্মানিত কিন্তু আসলে গোঁয়ার ন্যায়রত্নটি জনশ্রুতির পথ বেয়ে কিছু-সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়ে তাঁর কল্পনাকে আশ্রয় করেছিলেন, এই মনে হয়। তা ছাড়া তাঁর ছিরুপাল অনিরুদ্ধ রহম তিনকড়ি এরাও বেশির ভাগ type—বিশেষ ভঙ্গি-যুক্ত চরিত্র। জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে তারাশঙ্করের দৃষ্টি যে সত্যই বেশী নয় তার খুব ভাল প্রমাণ তাঁর 'পঞ্চগ্রামে'র অন্যতম

নায়ক দেবু ঘোষ আর বিশ্বনাথ। দেবু ঘোষ শেষের দিকে তার ভাবী বধূকে নিয়ে কল্পনার সায়রে ভেসেছে, তার অতীত-জীবন-ধারা যেন অর্থহীন হয়ে গেছে; আর ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত ত্যাগ-আদি বিপ্লবাত্মক কাজ করলে যেন হেসে খেলে—তার এই আঘাত তার পরিবেশের উপরে কতখানি বাজলো সে চেতনা তার আদৌ নেই। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজে'র সঙ্গে 'পঞ্চ-গ্রামে'র তুলনা করলেও ধরা পড়বে তারাশঙ্করের বাস্তবমুখিতার রোমান্টিক প্রবণতা।

তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র উচ্চ প্রশংসা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন—তিনি উপন্যাসটিকে দিয়েছেন এক মহৎ ট্র্যাজিডির মর্যাদা। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' যে একখানি শক্তি-শালী উপন্যাস, একালের বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় রচনা, তা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু একে ট্র্যাজিডির মর্যাদা কেমন করে' দেওয়া যেতে পারে তা ভেবে পাইনি। গ্রীক ট্র্যাজিডিতে আমরা দেখি দেবতার বা নিয়তির চক্রান্ত; আর শেক্স্পীয়রের ট্রাজিডিতে দেখি মানুষের নিজের ভিতরকার দুর্বলতার চক্রান্ত। কিন্তু এই সব চক্রান্তের সঙ্গে আর একটি ব্যাপারও দেখি, সেটি, চক্রান্তে যারা লাঞ্ছিত হচ্ছে সেই মানুষদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব—তারা দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু তাদের চরিত্রের গোপন দেশে আছে মহত্ত্বের বীর্য। একজন আধুনিক লেখক (Joseph W. Krutch) চমৎকার বলেছেন :

> The idea of nobility is inseparable from the idea of tragedy, which cannot exist without it. We accept gladly the outward defeats which it describes for the sake of the inward victories which it reveals.

A tragic writer does not have to believe in God, but he must believe in Man.*

Aristotle ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে pity আর fear-এর উপরে জোর দিয়েছেন ; কিন্তু তিনিও বলেছেন, ট্র্যাজিডির নায়ক হবেন এমন ব্যক্তি who is not eminently good and just, yet whose misfortune is brought about not by vice or depravity but by some error or frailty.‡

Krutch-এর সংজ্ঞা অনুসারে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে ট্র্যাজিডি বলার প্রশ্নই ওঠে না, Aristotle-এর সংজ্ঞা অনুসারেও ওঠে না, কেন না, 'হাঁসুলী বাঁকের আর তার নেতা বনোয়ারীর তথাকথিত পতন হ'ল কোনো error (ভুল) অথবা frailty-র (চারিত্রিক অদৃঢ়তার) জন্য নয়, হল অনেকখানি depravity-র (নৈতিক অধঃপতনের) জন্য, আর বিশেষ করে' অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে।

বইখানি আসলে এক অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার একটি বিস্তারিত কাহিনী মাত্র, যথেষ্ট দরদ দিয়ে বলা, তার সঙ্গে মিশেছে যারা অনুন্নত, বন্য, তাদের আদিম ধরন-ধারনের প্রতি তারাশঙ্করের রোমান্টিক-কবি-সুলভ পক্ষপাত। তাঁর

---

* ট্র্যাজিডির ধারণার সঙ্গে মহত্ত্বের ধারণা অবিচ্ছেদে যুক্ত, মহত্ত্বকে বাদ দিয়ে ট্র্যাজিডি দাঁড়াতে পারে না। ট্র্যাজিডি-বর্ণিত বাইরের পরাজয় আমরা সানন্দে স্বীকার করি সেই ট্র্যাজিডি অন্তর্লোকের যে সব বিজয় প্রকাশ করে সে সবের জন্য। ট্র্যাজিডির লেখক ঈশ্বরে বিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু মানুষে বিশ্বাস তাঁর চাইই।

‡ যিনি অসাধারণভাবে সাধু ও ন্যায়পরায়ণ নন, কিন্তু তাঁর যে দুর্ভাগ্য ঘটলো তা পাপাসক্তি বা নৈতিক অধঃপতনের জন্য নয়, তা ঘটল কিছু ভুল অথবা চারিত্রিক অদৃঢ়তার ফলে।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তে কুহকিনী বেদের মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

> বেদের কন্যে বেদেনী অবিশ্বাসিনী। রিত চরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতুন। রাত লাগলি আঁধার নামলি চোখে নেশা লাগে, বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে, নাগিনীর মতন সন সনিয়ে চলে, ফণা তুলে নাচে। সে নাচন যে দেখে সে সংসার ভুলে যায়।

তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় হাঁসুলী বাঁকের কাহার-মেয়েদের 'অঙের খেলা'র romance-এর উপরেও তাঁর প্রসন্ন নয়নপাত ঘটেছে। তাঁর এইসব বর্ণনা সহজেই অশ্লীল হয়ে উঠতে পারতো কিন্তু বন্য জীবনের ঋজুতা ও বলিষ্ঠতার প্রতি তাঁর রোমান্টিক-কবিজনোচিত প্রীতি সেই সংকট কাটিয়ে গেছে—এসব রচনা উপভোগ্য হয়েছে, রচনায় কৃতিত্বও যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর মজ্জাগত রোমান্টিক ভাবালুতা খুব নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক সম্পদ যে নয় সে-কথা ভুললেও চলবে না।—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করকে বলেছেন গ্রাম্য জীবনের চারণ কবি। এই হয়ত তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন—তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা দুয়েরই পরিচায়ক।

তারাশঙ্করের আর একখানি নামকরা বই হচ্ছে 'আরোগ্য-নিকেতন'। এতে এক জ্ঞানী কবিরাজের কথা বলা হয়েছে যিনি নাড়ী দেখে মৃত্যুর কাল বলে দিতে পারেন—পূর্বপুরুষ থেকে এই জ্ঞান তিনি পান। কবিরাজের এই বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভগবদ্-ভক্তি। সেই ভক্তি তাঁতে এনে দিয়েছে শান্তি, স্থৈর্য, জীবন-মৃত্যুর মরমীবোধ, সবার প্রতি বন্ধুভাব। এক সময়ে তিনি ছিলেন প্রতিশোধ-প্রিয়। প্রতিযোগিতায় তাঁর ছিল অসাধারণ উৎসাহ। কিন্তু এখন সেসব তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গেছে। তিনি সমদর্শী, বলেন ঃ বেদ অভ্রান্ত, নূতন বিজ্ঞান অভ্রান্ত বেদ।

কবিরাজের স্থৈর্য ও প্রীতির ভাবটি চমৎকার; কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তে শিথিলতা যথেষ্ট। বেদ অভ্রান্ত, নূতন বিজ্ঞান অভ্রান্ত বেদ—কিছু শুভ-ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য সম্পদ নেই এই চিন্তায়। আসলে কিছুই অভ্রান্ত নয়, আর উপেক্ষণীয়ও নয়। কিছুকেই চরম বা অভ্রান্ত জ্ঞান না করা অথচ অনুসন্ধিৎসা ও শুভ-সাধনা পুরোপুরি সক্রিয় রাখা—বলা যেতে পারে, এই আধুনিক সাধনা। তারাশঙ্করের কবিরাজ জীবন মশায়ের সে সাধনা নয়—হয়ত তারাশঙ্করেরও নয়। কিন্তু তাতে তেমন ক্ষতি ছিল না যদি জীবন মশায়কে পেতাম একটি concrete, বাস্তবতায় বিশিষ্ট, চরিত্ররূপে। কিন্তু তা তেমন হয় নি। 'আরোগ্য-নিকেতন' প্রচারধর্মী অনেক বেশি।

তাঁর 'আরোগ্য নিকেতনে'র পরের বই 'বিচারক' কিন্তু ভাল উৎরেছে। এতে যে ধরনের মনোবিশ্লেষণ আছে পূর্বে তাঁর 'তারিণী মাঝি' গল্পেও সেই ধরনের চেষ্টা তিনি করেন। 'বিচারকে' আমরা খুশী হই এইটি দেখে যে তাঁর শক্তিতে ভাঁটা পড়েনি।

তারাশঙ্কর বহু ছোট গল্পও লিখেছেন। সেসবে তাঁর বহু ধরনের অভিজ্ঞতা—তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক—প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ছোটগল্প সাধারণত কাহিনী-প্রধান। সুখপাঠ্য ছোটগল্প তিনি অনেক লিখেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা তাঁর রচনায় স্বভাবতই কম।

তারাশঙ্করের ভিতরে মরমী প্রবণতা আছে, তার ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সেটি বিভূতিভূষণের মতো সহজ নয়, অনেকটা প্রাচীন-ঐতিহ্য-প্রীতি থেকে জাত। তাহলেও তা দুর্বল ও গতানুগতিক নয়।

তারাশঙ্করের হৃদয়টি বিশাল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সে তুলনায় কম পরিচ্ছন্ন।

প্রবোধকুমার সান্যাল

'কল্লোল-গোষ্ঠী'র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে একধরনের বাস্তববোধ ও কিছু অতিরিক্ত রোমান্টিক প্রবণতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের পরে প্রবোধকুমার সান্যালের মধ্যেও প্রায় তেমনি ধরনের বাস্তববোধ ও রোমান্টিক প্রবণতা আমরা দেখি। তবে অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের বাস্তববোধের চাইতে প্রবোধ সান্যালের বাস্তববোধ অনেক স্থলে তীক্ষ্ণতর। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন।

তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসখানি তাঁকে খ্যাতিমান করে। এই বইখানিতে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা দুয়েরই যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। এটিকে জ্ঞান করা যেতে পারে তাঁর উপন্যাসগুলোর প্রতিনিধিস্থানীয়।

এতে একজন ঘরছাড়া যুবতীর পরিচয় হল একজন ঘরছাড়া যুবকের সঙ্গে, দুই জনই ভদ্রসমাজের। তারা পরস্পরের খানিকটা বন্ধু, এর বেশি কিছু নয়, এর বেশি অন্তরঙ্গতায় যুবকটির বিশেষ আপত্তি। এমনি দুই বন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই বইখানির বিষয়। কাজেই বইখানিতে অদ্ভুতত্ব ঢের। কিন্তু একে জনপ্রিয় করেছে সেই অদ্ভুতত্ব, বাস্তবের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয়, আর সমসাময়িক ছন্নছাড়া জীবন সম্বন্ধে নায়কের মুখে লেখকের ক্ষুব্ধ উক্তি। আমরা এই বইখানি থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি:

> শিল্পীরা হয়ত এমনই (শুধু কথা ও চিন্তার পুঁটুলি)! মানব-সমাজকে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনে তাহারা হয়ত উচ্ছৃঙ্খল, তাহাদের জীবনধারার পদ্ধতি সাধারণ মানুষের রুচিকর নয়।
>
> ....

কাল বৈশাখীর ঢুলে পড়া সে যেন একখানা জাহাজ—বিশৃঙ্খল, চূর্ণবিচূর্ণ, বিধ্বস্ত।

....

আমাদের হৃদয় মরে গেছে, মানুষের যত কিছু সুকুমার বৃত্তি সে আমাদের শুকিয়ে গেছে, আমরা ফতুর হয়ে গেছি! দেশের যৌবন আজ অবরুদ্ধ অন্ধকারে বন্দী হয়ে কাঁদছে, তার চোখে আলো নেই, তার নিঃশ্বাসে বাতাস নেই, তার প্রাণধারণের খাদ্য নেই।......মানুষের মতো মানুষ হয়ে সৎচরিত্র হয়ে সুন্দর হয়ে বাঁচবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাঁচবার জায়গা কোথায়? এদের মধ্যে? এই দারিদ্র্য, এই লজ্জা, এই নৈতিক পঙ্গুতা, সংস্কারের গ্লানি, এই কদর্য রীতি জঘন্য আচার—এদের মধ্যে বাঁচবো কেমন করে?

....

সর্বহারা নগণ্য বাঙ্গালীর ছেলে, যার অতীত জীবন অন্ধকার, ভবিষ্যৎ কুহেলিকাচ্ছন্ন, ক্লেদক্লিন্নতা নিয়ে যার দিন কাটে, প্রেম সঞ্চারিত হবার মতো সে উদার ব্যাপকতা তার বুকের মধ্যে কোথায়? আমি দেখলাম শুধু বন্দী সতীত্ব, কাম-জর্জরতা, সন্তানধারণের অক্লান্ত অধ্যবসায়, আমি দেখলাম বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের কুৎসিত জীবন-যাত্রা, প্রেম ত আমি জানিনে! প্রেম? সে ত সৌখিন সমাজের স্বপ্নবিলাস। এদেশে প্রেম কোথায়? যেটুকু আছে সে কাঁচা নাটক নভেলের পুঁজিমাত্র।

....

তুমি আধুনিক যুগের প্রতীক, উৎপীড়িত ও অশান্ত, অতৃপ্ত আর বিক্ষুব্ধ—তোমাকে আমি চিনতে চাই, তুমি আপন সত্যকে প্রকাশ করো। জীবনকে বিকশিত করার সাধ্য

তোমার নেই, আশায় জর্জর ভাগ্যের দ্বারে চিরপ্রত্যাখ্যাত —আলোকের পথ তোমার চোখে লুপ্ত হয়েছে—অনন্ত ক্ষুধা রুদ্ধ ক্ষোভে তোমার মধ্যে মাথা কুটে মরছে ; হে পরাধীন, হে নবীন, হে ব্যর্থ, তোমাকে আমি আশ্রয় দিতে চাই।

....

কিন্তু এই সিনিসিজি্‌ম্‌-এর আয়নায় তোমার প্রতিফলিত চেহারা আমি দেখেছি। এ-পিঠে তুমি এই, ও-পিঠে তুমি ড্রিমার, রোমাণ্টিক, আবেগময়।

একই সঙ্গে এমন অনেকখানি বাস্তবের বোধ আর স্বাপ্নিকতা, আর চিন্তা ও অনুভূতির শিথিলবন্ধ প্রকাশ—বলা যেতে পারে, এই আমাদের সমসাময়িক কথাসাহিত্যের বড় অংশের পরিচয়।

ছোট গল্প

একালে কিছু ভাল ছোট গল্প লেখা হয়েছে সে কথা আমরা বলেছি। সেদিকটায় আরো একটু তাকানো যাক।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশে'র উল্লেখ করা হয়েছে। 'মহেশ' ভিন্ন শরৎচন্দ্রের উৎকৃষ্ট ছোট গল্প হচ্ছে 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী', 'মামলার ফল', 'বিলাসী' আর 'হরিলক্ষ্মী'। এ ভিন্ন তিনি অবশ্য আরো বহু গল্প লিখেছেন যেগুলো চিত্তাকর্ষক। কিন্তু ছোট গল্পের যে বিশেষ গঠন ও আবেদন সেটি সেগুলোতে নেই। সেগুলো সাধারণত বড় গল্প বা উপন্যাস সংক্ষিপ্ত করে' বলা। কিন্তু ছোট গল্প ঠিক তাই নয়। ছোট গল্পে গল্প অবশ্য কিছু থাকবেই, কেননা, ছবি ফোটা চাই—ছবি না হলে শিল্প-সৃষ্টি আর কি করে' হবে। কিন্তু গল্পের অংশ যদি পল্লবিত হয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে তবে ছোট গল্পের রস নষ্ট হয়। ছোট গল্প যেন একটি সোনার আংটি, যার উপরে এক কণা হীরে বসানো আছে। সোনাটুকু অবশ্য চাই, কিন্তু হীরের কণিকাটিই আংটিটিকে বিশেষ

মর্যাদা দিয়েছে। তেমনি ছোট গল্প মর্যাদা পায় যদি তাতে জীবনের একটি খণ্ডাংশ হীরের কণার মতো একটি বিশেষ ভাবের দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়। শরৎচন্দ্রের কতকগুলো ছোট গল্প, তেমন মহৎ মর্যাদা লাভ করেছে। 'মহেশ' বড় গল্প, কাহিনীর অংশ বেশ বড়, কিন্তু ছোটগল্পের জন্য চাই যে ভাবের হীরের কণাটি সেটিও এতে আছে—মহেশের মৃত্যু এবং গফুরের অন্তিম অভিসম্পাত কাহিনীটিকে অসাধারণভাবে কেন্দ্রীভূত করেছে। আর, একটি ছোট গল্প মাত্র হয়ে এটি যে জীবনকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করেছে তাতেও এর গৌরব খুব বেড়েছে।—গভীর জীবন-বোধ ও জীবন-দর্শন যে সাহিত্যে বড় সম্পদ শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' তার এক ভাল প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের পরে ভাল গল্প লিখেছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী ও নরেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখিতে পাই ; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্ম-বিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই।

যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পে এমনি বাস্তবিকতা আর অনির্বচনীয় রহস্যের সম্মিলন ঘটেছে।

তাঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। যাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি তাঁদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী খুব বিশিষ্ট।

বাস্তবিক শরৎ-উত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প লিখিয়েদের অন্যতম

তিনি। তাঁর জগৎ অবশ্য সংকীর্ণ—মুখ্যত বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের নারী-জগৎ। কিন্তু সেই জগৎ তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে তীক্ষ্ণ রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি আর অব্যর্থ রেখাপাত আমাদের নারী-সাহিত্যিকের মধ্যে একান্ত বিরল। তাঁর সীমাবদ্ধ জগতের সর্বময়ী কর্ত্রী যেন তিনি—তাঁর তির্যক দৃষ্টিকে সে-জগতের পুরুষদেরও সমীহ করে' চলতে হয়। তাঁর সুবিখ্যাত 'অভিনেত্রী' গল্পের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

> নদীর মতো আপন বেগে প্রবাহিত হতে চাইলে চলবে কেন তার?……একদিকে ভরাট করে তুলতে—অপর দিকে ভাঙন ধরাবার মতো বোকামি তার নেই। দুই কূল সযত্নে রক্ষা করে চলতে হয় তাকে। রক্ষা করতে হয় সংসার, রক্ষা করতে হয় দাঁড়াবার ঠাঁই।
>
> অনাদরকে তার বড় ভয়, বড় ভয় অবহেলাকে!
>
> নাকি এ তথ্যের সবই ভুল?
>
> কোনোটাই তার অভিনয় নয়? চিরন্তনী নারী-প্রকৃতির মধ্যে পাশাপাশি বাস করছে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সত্তা, জননী আর প্রিয়া। নিজের ক্ষেত্রে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
>
> মমতাময়ী নারী তার এই বিভিন্ন দুটি সত্তার বিশাল পক্ষপুটের আড়ালে সযত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে চিরশিশু অবোধ পুরুষ জাতিকে।
>
> ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা……এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা-লেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশু-ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো—কদিন লাগতো পৃথিবীটা ধ্বংস হতে!

আশাপূর্ণা দেবী উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু ছোট গল্পই তাঁর বিশিষ্ট দান।

এ যুগের বাংলা ছোট গল্প সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিভাগ নিঃসংশয় অগ্রগতির চিহ্ন বহন করে, তাহা হইল ছোট গল্প। এই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর যেকোনো দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলার সমাজ ও জীবনে যে বিচিত্র ও গভীর পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সার্থকতম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে বাঙালীর জীবন-যাত্রায় যে নিদারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে যে তিক্ত-অভিজ্ঞতা-প্রসূত নূতন অনুভূতি জাগিয়াছে, সমাজ-ও-পরিবার-জীবনের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয় হইতে উৎখাত হইয়া যে শূন্যতা-বোধ ও উদ্‌ভ্রান্তি ব্যক্তিসত্তাকে গ্রাস করিয়াছে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে তাহার সবটুকুই প্রতিফলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প বিশ্ববিখ্যাত—পরিমাণেও কম নয়। তাঁর পরে শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আরো কয়েকজন বাঙালী লেখক-লেখিকা যে উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন তারও সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে। সুখপাঠ্য গল্প তো অনেকেই লিখেছেন। কাজেই বাংলা ছোট গল্পের যে মর্যাদা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন তা মেনে নেবার পক্ষে কোনো বাধা নেই বলেই মনে হয়। সাহিত্যের মর্যাদা পরিমাণের উপরে যতটা নির্ভর করে তার চাইতে বেশি নির্ভর করে গুণের উপরে, এই বিবেচনা থেকে বলা যায়, বাংলা সহিত্যের অন্যান্য বিভাগও, যেমন, কাব্য উপন্যাস ও নিবন্ধ, জগতের বড় সাহিত্যগুলোর তুলনায় হীনমর্যাদার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে সব বিভাগেই বাংলা

সাহিত্যের সাধারণ মান উঁচু নয়, বরং নীচু। একালের বাংলা ছোট গল্পের যে মর্যাদা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন তাও বিচার করে দেখা দরকার।

একটি কিছু-নামকরা ছোট গল্প নেওয়া যাক—সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি'। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, এই গল্পটি

> আদর্শবাদে দৃঢ়, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামশীল পরিবারের যুগপ্রভাবে ধীরে ধীরে নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ইতিহাস বিবৃত করিতেছে। এখানে অতিরঞ্জনের বীভৎসতা নাই, আছে তিলে তিলে নৈতিক দৃঢ়তা ও প্রতিরোধশক্তির ক্ষয়।

কিন্তু সত্যই কি সেই ধরনের বিবৃতি এই গল্পটিতে আছে? সাংবাদিক ধরনে আছে, কিন্তু যথার্থ সাহিত্যিক ধরনে নেই, কেননা, পরিবারটি যে আদর্শবাদে দৃঢ়, অর্থাৎ আদর্শবাদ যে সত্যই ভালবাসে, তার কোনো পরিচয় এতে নেই—তেমনি নেই পতন ঘটার জন্য বেদনার বা অস্বস্তির কোনো চিহ্ন। অর্থাৎ, এমন পতন সম্বন্ধে চিন্তা লেখকের মনে খেলেছে, সেই চিন্তা তিনি বিবৃত করেছেন একটি গল্প খাড়া করে; কিন্তু এমন পতন ঘটার মর্মান্তিক সত্যের সম্মুখীন তিনি হননি—তাই তাকে রূপও দিতে পারেননি। এই গল্পটির সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পটি মিলিয়ে পড়লেও কিছু বোঝা যাবে কেন এটি সাংবাদিকতার স্তর ডিঙোতে পারেনি।

এ কালের অনেক গল্পেই রয়েছে এমন চিন্তার ও কথার খেলা, অথবা মারপ্যাঁচ। এরও একটা দাম আছে। আমাদের একালের লেখকরা যে তাঁদের পরিবেশ সম্বন্ধে অনেকখানি সজাগ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু সেই চেতনা দিয়ে তাঁরা যা সৃষ্টি করছেন তার খুব বড় অংশই যে সাধারণ সাংবাদিকতা—তাই অত্যন্ত ক্ষণজীবী—তাও বোঝা দরকার।

শরৎ-উত্তর কালের আরো কয়েকজন খ্যাতিমানের কথা আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা করবো।

মনোজ বসু

বহু বই—গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন ইনি। এঁর স্বচ্ছন্দ বর্ণন-শক্তি সহজেই পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করে।

বাদা অঞ্চলের রূপ এঁর রচনায় ভাল ফুটেছে।

কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিতে এঁর তেমন কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। এঁর একালের 'মানুষ নামক জন্তু' উপন্যাসখানিতে ইনি রূঢ় বাস্তব রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা খুব চোখে পড়বার মতো হলেও সত্যকার সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেনি, এই মনে হয়েছে—বাস্তবতা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে বীভৎসতায় পরিণত হয়েছে। মাত্রাবোধ যেমন জীবনে অত্যাজ্য তেমনি সাহিত্যেও।

বনফুল

ইনিও বহু বই লিখেছেন। জনপ্রিয়ও ইনি। মোহিতলাল মজুমদার এঁর গল্প-উপন্যাসের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এঁর রচনায় তেমন কোনো সম্পদ পাইনি।

এঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে—এঁর জনপ্রিয়তার মূলে সেটি হয়ত অনেকখানি। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল থেকে উচ্চ সাহিত্যিক সম্পদ লাভ হতে পারে না। সাহিত্যিক সম্পদের অন্য নাম মানবিক সম্পদ—অর্থাৎ মানুষের সুখ দুঃখ বিষাদ নৈরাশ্য উল্লাস, তার জীবন-দর্শন, এ সবের সার্থক রূপায়ণ। সেই রূপায়ণ এঁর বহু-তথ্যে-সমৃদ্ধ রচনাগুলোয় তেমন ঘটে ওঠেনি।

হাস্য-কৌতুকের অবতারণা এঁর রচনায় বেশ করা হয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইনি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবেই খ্যাত। তবে উপন্যাসও লিখেছেন—তাতে চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন জীবন-দর্শন ব্যক্ত করতে—অবশ্য চরিত্রের মুখে। সচেতনতা এঁর নায়কের কাছে মহামূল্য—সেই সচেতনতার যদি কোনো সামাজিক পরিচয় না থাকে তবুও। সেজন্য মৌনী তৈলঙ্গ স্বামীকে তিনি জ্ঞান করেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শাখাহীন তালগাছ তাঁর চোখে শ্রেষ্ঠ জীবনের প্রতীক। "ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে" এই তাঁর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

বলাবাহুল্য এসব চিন্তা বেশ চমকপ্রদ হলেও একপেশে। এসব সত্যকার ভাবে জীবনধর্মী নয়, কেননা প্রেমধর্মী নয়। এসবকে তাই স্বল্পমূল্য ভিন্ন আর কিছু বলা কঠিন।

এঁর নায়িকার চরিত্র তো খুবই অদ্ভুত হয়েছে। একজন শিক্ষিতা ও অনেকখানি সচেতন মহিলার তেমন পরিণতি ভাবা যায় না, কেননা ভাবা স্বাভাবিক বা মাত্রাসম্মত নয়।

সচেতনতা ধূর্জটিপ্রসাদ বহুমূল্য জ্ঞান করেছেন—তার বিরুদ্ধে কিছু না বললেও চলে। কিন্তু সেই সচেতনার রূপ আঁকতে পারেননি তিনি। আত্মকেন্দ্রিক চারিত্রিক-বীর্য-বিহীন নায়ক আর মতিচ্ছন্ন নায়িকা বুদ্ধিতে চোখা হলেও সচেতনজাতীয় নয়।

ধর্মে দেবতা গড়তে গিয়ে অনেক অপদেবতা গড়া হয়েছে; সাহিত্যেও তেমনি মানুষ গড়তে গিয়ে অ-মানুষ গড়া হয় ঢের।

দিলীপকুমার রায়

'দোলা', 'বহুবল্লভ' 'দুধারা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখে ইনি সেদিনে পাঠকদের মনোযোগ বেশ আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর এই সব বইতে অনেক ইয়োরোপীয় চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে, আর প্রেমের বিচিত্র সমস্যার সন্মুখীন হতে চেষ্টা করা

হয়েছে। এসবই হয়ত হয়েছিল এই লেখাগুলোর প্রধান আকর্ষণ-স্থল।

দিলীপকুমারের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'দুধারা' কিছু বিশিষ্ট। এতে তিনটি চরিত্র—হারমান, হারমানের প্রেমময়ী পত্নী মিনা আর হারমান ও মিনা উভয়ের বন্ধু নিলয়। হারমান ও মিনার দাম্পত্য-জীবন সুখের। কিন্তু স্বামীর প্রতি অনুরাগের প্রবলতা সত্ত্বেও মিনার অন্তরে নিলয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মালো এবং অল্প দিনেই তা প্রবল হ'ল। মাঝে মাঝে মিনাতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে নিলয়কে আত্মদান করতে। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার অনুরাগে ও কর্তব্যবোধে সে বাধ্য হয় নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে। এমন তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে।

হারমানকে লেখক খুব উদার করে' এঁকেছেন। মিনা যদি তাকে ত্যাগ করে' নিলয়কে বিয়ে করতে চাইত তাতেও হারমান আপত্তি করতো না। কাজেই সমস্যাটা মিনার নিজের মনের—একই সঙ্গে স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও কর্তব্যবোধ আর নতুন প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণ, এই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তার জীবনে।

কিন্তু মনে হয় এই দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখক দার্শনিকতা করেছেন বেশি। জীবনে এমন দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন টানা-হিঁচড়ার অবস্থায় না থাকাই স্বাভাবিক। নিলয় মানুষটিকে বোঝা গেল না—সে যেন সাঙ্খ্যের পুরুষ, প্রকৃতি যা করায় তাই সে করে।

বোঝা যাচ্ছে দিলীপকুমারের রচনা চিন্তা-প্রধান—সত্যকার জীবনসৃষ্টি তেমন হয়নি। তবে তাঁর আঁকা অনেক ছোটখাটো চরিত্র বেশ ফুটেছে।

রামপদ মুখোপাধ্যায়

এঁর 'শাশ্বত পিপাসা' সেকালের 'স্বর্ণলতা' জাতীয় উপন্যাস। বিদেশী প্রভাব থেকে আজো মুক্ত আমাদের যে গ্রামীণ

মধ্যবিত্ত সমাজ তার পারিবারিক জীবনের একটি অনাড়ম্বর বাস্তবধর্মী চিত্র এতে ফুটে উঠেছে। এর নায়িকা প্রায় বালিকা বধূ—আস্তে আস্তে প্রায় দশ বৎসর ধরে শাশুড়ীর অপ্রসন্নতা সয়ে অবশেষে পত্নী ও জননীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'ল। প্রতিদিনের ছোটখাটো গৃহস্থালীর কাজ, শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা, এর ভিতর দিয়েই সে শিখলো, নারী স্বামী ও সন্তান নিয়ে সংসার-ধর্ম করেই তৃপ্ত।

এর অন্যান্য চরিত্রও সাধারণ বাঙালী মেয়ে ও পুরুষ—কিন্তু অনেকখানি স্পষ্ট করে' আঁকা। বধূর পিতা রামজীবন দারিদ্র্যের জন্য কন্যা-জামাতাকে প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে অক্ষম হ'ল, আর সেজন্য বেয়ানের অপমান নীরবে সহ্য করলো।

চরিত্রগুলো সবই এমন যাদের প্রাণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ্য, সুখ-দুঃখ, সবই ছোট মাপের। কিন্তু ছোট মাপের মধ্যে তারা বেমানান নয়, বরং সুসঙ্গত।

লেখক কি প্রাচীন ধারার পুনরুজ্জীবন চাচ্ছেন? হয়ত চাচ্ছেন। কিন্তু প্রাচীন বলে নয়, বাংলার পরিবেশে সুসংগত বলে। এমন পুনরুজ্জীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রেরও দৃষ্টি ছিল সশ্রদ্ধ, যদিও 'শেষ প্রশ্নে'র মতো বইও তিনি লিখেছিলেন।

কাজি ইমদাদুল হক

ইনি শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, আর বালকপাঠ্য রচনাই লিখেছিলেন বেশি। তবে উপন্যাসও একখানি লেখেন, আর সেটি খুব বিশিষ্ট।

এঁর সেই উপন্যাসের—বা সমাজ চিত্রের—নাম 'আবদুল্লাহ্'। এর রচনাকাল ১৯১৯-২০। সেইকালেই 'মোসলেম ভারতে' এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পুস্তক আকারে এটি প্রকাশিত হয় বোধ হয় ১৯৩৪ সালে। এতে

বাংলার মুসলমান সমাজের, বিশেষ করে' তার সম্ভ্রান্ত অংশের, অবক্ষয়ের ছবি অতি নিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে। লেখকের সুমার্জিত ও মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খুব লক্ষণীয়।

এই বইখানি পড়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "...বইখানি আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। দেখছি যে ঘোরতর বুদ্ধির দৈন্য হিন্দুকে সর্বপ্রকারে দুর্বল করে রেখেছে তাই মুসলমানের ঘরে ধুতিচাদর ত্যাগ করে লুঙি ফেজ পরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ! ..."

বইখানির মর্যাদার দিকে দেশের শিক্ষিত-সাধারণের দৃষ্টি আজো যোগ্যভাবে আকৃষ্ট হয়নি।

গোপাল হালদার

প্রাবন্ধিক রূপেই ইনি সুপরিচিত, তবে উপন্যাসও লিখেছেন, আর সেসবের মধ্যে 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' এই ত্রয়ী বিখ্যাত।

এই বই তিনখানি অর্থপূর্ণ হয়েছে দুই ভাবে—কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের এক জোরালো বিবৃতিরূপে, আর উদার মানবিক জগৎ থেকে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ক্ষেত্রে লেখকের বেদনাময় নব জন্মলাভের ইতিহাসরূপে। এই শেষোক্তরূপেই রচনাগুলো বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে।

এই ত্রয়ী অমিত নামক একজন ইতিহাস-সচেতন বিপ্লবীর অথবা বিপ্লবীদের বন্ধুর দীর্ঘ আত্মকাহিনী। অমিতের কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধুর তাদের-বেছে-নেওয়া কঠিন পথে পদচারণার অন্তহীন দুর্ভোগের চিত্র, সংস্কৃতির প্রাচীন আদর্শ আর একালের নতুন আদর্শ অমিতের মনে এই দুয়ের দ্বন্দ্ব, অমিতের পরিচিত বহু নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনের নানা ধরনের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা ব্যর্থতা, এই সবই এতে বিবৃত হয়েছে গভীর সমবেদনার সঙ্গে—

যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গেও বটে। বিচিত্রচরিত্র মানুষের দিকে গোপাল হালদারের দৃষ্টি যে গভীর ঔৎসুক্যপূর্ণ—তিনি শেক্স্পীয়রের একজন ভক্ত পাঠক—অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তাঁর ভিতরে রয়েছে যে একটি রোমান্টিক চেতনাও—মাঝে মাঝে এসবের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ঘটেছে এই লেখাগুলোয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রভাবাধীন যদি গোপাল হালদার না হতেন তবে উদারমানবিক ক্ষেত্রেও তিনি হয়ত যশস্বী সাহিত্যিক হতেন।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রভাব বাস্তবিকই প্রবল হয়েছে তাঁর উপরে—তিনি যেন নিঃসন্দেহ যে সেই ধারা তাঁর জীবনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সত্যকার সার্থকতার পথে। তাঁর 'আর এক দিন'-র শেষে নায়ক অমিতের মুখে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে এই ভাবে ঃ

> 'কোথায় তোমার পরিচয় অমিত ?' জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেম-মণ্ডিত গৃহ রচনায় ; ধ্যান-সুন্দর, প্রীতি-সুন্দর গোষ্ঠী রচনায় ; একান্তে বসিয়া আত্ম রচনায়। জ্ঞানে চিন্তায়ভাবনায়, কাব্য-কলায়, শিল্পে—কোথাও আর কোনো পরিচয় নাই তোমার। পৃথিবীর চোখে তাই ব্যর্থ, বিক্ষিপ্ত তুমি। কিন্তু মানুষের এই মহদভিযানের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াও সম্পূর্ণ তুমি। জীবনের এই জোয়ারের মধ্যে ডুবিয়া ভাসিয়া পাইয়াছ জীবন-রসের পরম আস্বাদন...মানুষের এই স্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই পাইয়াছ কৌতুকে আনন্দে মানব-মহারসের অপরূপ উপলব্ধি। Only in intense living do we touch infinity.

কিন্তু উদ্ধৃতির শেষে যে ইংরেজী বাক্যটি রয়েছে তাতেই ব্যক্ত হয়েছে কমিউনিস্ট পন্থায় যত বড় নিষ্ঠা তাঁর অভিপ্রেত তাঁর অন্তর-

জীবনে সেটি ঘটে ওঠেনি; তিনি কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী যতটা উদারমানবিক তার চাইতে কম নন, আর তাঁর রোমান্টিক চেতনাও তাঁকে ত্যাগ করে' যায়নি। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে প্রথম যখন তিনি সচেতন হন তখনই তিনি নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন যে জীবনের সত্যরূপ 'ফেনায়িত উদ্দাম প্রয়াসে নয়' 'চিন্তা সাধনা অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এসবে নয়' কেননা এসব 'বিকৃত ঐশ্বর্যের চাপ থেকে পালিয়ে বিকৃত অবাস্তবতার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা' জীবনের সত্যরূপ কর্মে, টেকনিকে, কেননা 'টেকনিক মানে সৃষ্টি—সৃষ্টিই জীবনের পরম বাণী, জীবনের পরম রহস্য'। কিন্তু সেই কর্ম ও টেকনিকের মহিমা বহু দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে বহুভাবে জপ করার পর আবার কেন তাঁর মুখে শুনি অনন্তের স্পর্শ লাভের কথা। টেকনিকের সাহায্যে সৃষ্টির মহিমা আর অনন্তের স্পর্শের মহিমা এই দুটি কি সহজ যোগে যুক্ত তাদের মধ্যে যারা টেকনিকের মহিমায় একান্ত আস্থাবান?

কিন্তু আমরা তাঁর অন্তর-জগতে এমন দ্বিধা দেখলেও গোপাল হালদার নিজে হয়ত তা স্বীকার করেন না, হয়ত তিনি সেবিষয়ে সচেতনও নন, কেননা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবপন্থা যে একালের মানুষের জন্য একমাত্র সার্থকতার পথ এই মত তাঁর বইগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে এক অসাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গে, আর বহু জায়গায়। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে বহু উদ্যমের বহু বিপ্লবের যখন মাত্র আংশিক ফললাভ দেখা গেছে তখন কমিউনিস্ট বিপ্লবের কাছ থেকে ষোলো আনা ফল আশা করা একজন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তির পক্ষে খুব অদ্ভুত নয় কি? হয়ত বলা হবে—অতটা বলা হয়েছে তর্কের মুখে। কিন্তু একজন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি তেমন তর্কই বা কেমন করে' করতে পারেন?

কমিউনিস্ট-পন্থা যে আমাদের দেশে একদল উচ্চ শিক্ষিতের

মনেও এমন অন্ধ আবেগ এনে দিতে পেরেছে এ কমিউনিস্ট পন্থার বাহাদুরি সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় মনোজগতের জন্য এ এক বড় রকমের সঙ্কট। কেননা ভারতীয় ঐতিহ্যে আচারের অন্ধতা যথেষ্ট প্রশ্রয় পেলেও চিন্তার অন্ধতা সাধারণত প্রশ্রয় পায়নি। পণ্ডিতদের মতে চিন্তার ক্ষেত্রে অন্ধ আবেগ হিব্রু ঐতিহ্যেরই—সুতরাং ইয়োরোপেরই—বিশেষ লক্ষণ।

গোপাল হালদারের এই বইগুলো যখন প্রথম পরিকল্পিত হয়েছিল তখন অবশ্য কমিউনিস্ট-পন্থা জগতের প্রায় সর্বত্র একটা বড় রকমের সমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু আজ অ-কমিউনিস্ট জগতে এর সে প্রভাব কমে এসেছে—কমিউনিস্ট জগতেও চিন্তার কিছু কিছু 'অস্বস্তিকর' বৈচিত্র্য যে দেখা না দিচ্ছে তা নয়। আজ গোপাল হালদারের মতো কমিউনিজমে আস্থাবান ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তিরা কি ভাবছেন তা জানতে কৌতূহল হয়।

গোপাল হালদারের প্রশংসনীয় ইতিহাস-সচেতনতায় প্রথম থেকেই একটি বড় রকমের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সেটি হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অচেতনতা। বলাবাহুল্য আনুষ্ঠানিক ধর্মের কথা আমরা বলছি না ; আমরা সেই ধর্মের কথা বলছি যা না বুঝলে বুদ্ধ, সক্রেটিস, যীশু, মোহম্মদ, মানুষের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের বোঝা হয় না—সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ রূপকেই বোঝা হয় না। প্রাচীন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তিনি যা দেখেছেন তা হচ্ছে প্রশান্তি। কিন্তু এই মহামানবদের মধ্যে প্রশান্তির চাইতেও বড় সম্পদ আছে—সেটি হচ্ছে অন্তহীন প্রেম ও শুভসাধনা। কমিউনিজমে শুভ-সাধনার উপরে বেশ জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রেমের উপরে নয়। তাতে শুভ-সাধনার সফলতার পথে এক বড় বাধা স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সে-দিকটা গোপাল হালদার ভুলেও মাড়াননি।

অমরেন্দ্র ঘোষ

ইনিও বামপন্থী। কিন্তু বামপন্থী চিন্তা এঁর ভিতরে যত প্রবল তার চাইতে অনেক বেশি প্রবল দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানুষের জন্য এঁর দরদ। অনেকগুলো উপন্যাস ইনি লিখেছেন; কিন্তু সেসবের মধ্যে খুব বিশিষ্ট হয়েছে 'চরকাশেম'। বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের পদ্মার এক নতুন চর কেমন করে' আবাদ হ'ল বহু দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে, আবাদ হল প্রধানত ঐ অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের অসাধারণ শ্রমের দ্বারা—এইই বইখানির প্রধান বিষয়। এই সঙ্গতিহীন মানুষগুলোর জান্তব জীবনের বলিষ্ঠ শ্রীছাঁদ অমরেন্দ্র ঘোষের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এতে যেসব মেয়ে চরিত্র দাঁড় করানো হয়েছে তারাও প্রাণবন্ত—তাদের কর্মনিপুণতা, কোন্দলপ্রিয়তা, বংশগর্ব, সবই লেখকের সপ্রেম দৃষ্টির সামনে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের বামপন্থীদের লেখা মুষ্টিমেয় সফল উপন্যাসের মধ্যে 'চরকাশেম' অন্যতম—হয়ত শ্রেষ্ঠতম। সুবিখ্যাত Growth of the soil-এর সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইনি উপন্যাসও লিখেছেন, কিন্তু এঁর বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে হাসির গল্পে। সেই সব হাসি-তামাসার ভিতর দিয়ে জীবন সম্বন্ধে এঁর গভীর বোধও যে ব্যক্ত হয়েছে তাতেই এঁর হাসির গল্পগুলো এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী

বিহারবাসী বাঙালী। এঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' লিখেই ইনি ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী হন। উপন্যাসটি মনস্তত্ত্বমূলক। পিতা স্কুলের শিক্ষক, গান্ধীবাদী, আর প্রকৃতিতে কিছু খেয়ালী।

তাঁর বড় ছেলে বিলু সুশিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক—৪২-এর আন্দোলনে ধরা পড়েছে আর মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা লাভ করে' তার নির্জন 'সেলে' দিন গুণছে। তার দণ্ডাজ্ঞার মূলে তার ছোট ভাই নীলু—বিলুদের সে জ্ঞান করে ফ্যাসিস্ট। পরিবারের এমন পরিণতিতে বিলু ও নীলুর মা আকুল হয়ে ভাবছেন গান্ধীদেবতা কি করলেন—তাঁর নির্দেশ মতো চলে তাদের জীবনে একি পরিণতি ঘটলো!

মনোবিশ্লেষণে লেখক কুশলী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরিত্র-গুলো যে ভাল দাঁড়িয়েছে তা বলা যায় না। বিলু সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী; কিন্তু মৃত্যুচিন্তা তাকে আকুল করেছে বেশি। তার ফলে তার চরিত্রের আর কোনোদিক তেমন ফোটেনি।—শেষ পর্যন্ত বিলু অবশ্য মুক্তি পেল।

এঁর অন্যান্য রচনাও মনস্তত্ত্ব-মূলক। তবে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ ধূর্ত ঢোঁড়াইয়ের রকমসকম ও বাকভঙ্গি বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এঁর 'গড়শ্রীখণ্ড' বড় উপন্যাস। বহু চরিত্রের অবতারণা তাতে হয়েছে। লেখক চিন্তাশীল—জীবন সম্বন্ধে গভীর চিন্তার পরিচয় মাঝে মাঝে দিয়েছেন। এক জায়গায় বলেছেন, তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিক হওয়ার চাইতে প্রথম সারির বাঁচিয়ে হওয়া ভাল। কিন্তু বাঁচা বলতে কি বোঝায়—কোন্ পথে বাঁচা যায়—সেসম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ছবির অবতারণা নেই। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কালের কথা এতে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এক ঘর জমিদার আর সেই অঞ্চলের মুসলমান বাসিন্দাদের কাহিনী এর প্রধান বিষয়। জমিদার-পরিবার সুশিক্ষিত; কিন্তু সংকট কালে যথার্থ করণীয় কি তা তাঁরা ভেবে পেলেন না। অবশেষে দেশ ত্যাগ করলেন।

মুসলিম লীগের প্রচারণার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কেমন একটি বিশিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হল সে-ব্যাপারটি এতে দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বহু গল্প উপন্যাস লিখেছেন ইনি। এঁর গল্পের খ্যাতিই বেশি। এঁর গল্পগুলো সহজেই পাঠকদের মন আকর্ষণ করে। কিন্তু আকর্ষণ করে ইনি যে একটু বেশি চড়া রং দিয়ে ছবি আঁকেন অনেকটা সেইজন্য—অবশ্য আঁকেন যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে। এঁর একটি বিখ্যাত গল্পের নাম 'টোপ'। তাতে ধনীদের অমানুষিকতা অবিশ্বাস্য রকমে উৎকট হয়েছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এঁর নামকরা বই হচ্ছে 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'—হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস। মানিকপুরের লোহার কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ভিতরকার দ্বন্দ্বের কাহিনী এর মুখ্য বিষয়। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের, মালিকদের ও তাদের পরিজনদের বিচিত্র চরিত্র ফোটাবার চেষ্টা এতে করা হয়েছে।

মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ও সেই বহুমুখী দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা, এইদিকেই লেখক বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন, আর সেই সম্পর্কেই নানা চরিত্রের অবতারণার প্রয়োজন হয়েছে। কারখানার মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য লেখক যে পথে অগ্রসর হয়েছেন সে পথকে বলা যায় মানবিকতার পথ। শ্রমিক ও মালিক দুই দলেরই কল্যাণ যাতে হয়, দুই দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি প্রেমপ্রীতি যাতে বাড়ে, এই তাঁর অবলম্বিত পথ। কমিউনিস্ট দের যে আপোসহীন সংগ্রামের পথ সে পথ তাঁর নয়।

শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখক যে বহু দিক

দিয়ে ভেবেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু উপন্যাসের বড় ব্যাপার যে চরিত্র-চিত্রণ সে ক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য কতখানি? বহু চরিত্র তিনি আমাদের সামনে এনেছেন, তাদের একজনের সঙ্গে অপরজন ঘুলিয়ে যায় না; তাই কিছু চরিত্র তিনি যে আঁকতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাকে বলা হয় সার্থক চরিত্র-সৃষ্টি তা কমই হয়েছে। এতে সাধু-উদ্দেশ্য-যুক্ত চরিত্র আঁকা হয়েছে অনেক; তারা আমাদের মনকে কিছু আকর্ষণও করে। কিন্তু কোথায় যেন ত্রুটি আছে যার জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের তেমন প্রাণবন্ত মনে হয় না। নায়ক দেবজ্যোতি যথেষ্ট ভাল মানুষ—মহদাশয়—কিন্তু দোল খায় বেশি। তাতে তার চরিত্র অনেকখানি ঘুলিয়ে যায়। বিধবা অমলার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক দাঁড়ালো তা শেষ পর্যন্ত অর্থপূর্ণ হ'ল না, কেননা, অমলার মনের কামনাকে অতি শীগগির ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল—তাতে ব্যাপারটা অনেকখানি অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ালো। এতে একমাত্র স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ চরিত্র রাম অবতার। সে লেখাপড়া জানে না, কিন্তু সত্যকার উদ্যোগী—শ্রমিকদের ভালোর কথা সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে ভাবে। তার সেই দ্বিধাহীনতা শেষ পর্যন্ত দেবজ্যোতিকে পথে আনলো।

'ইস্পাতের স্বাক্ষর' যে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এটিকে খুব সার্থক বলা যায় না। এটিকে বলা যেতে পারে মানিকপুরের লোহার কারখানার পুরাণ—যেমন 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'আকাশ পাতাল' এক একটি পুরাণ। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'ও পুরাণজাতীয়; তবে তার সাহিত্যিক মর্যাদা এদের চাইতে বেশি।

বর্ণনার দিকে একালের লেখকদের মন বেশি গেছে, সে তুলনায় চিন্তার দায়িত্ব তাঁরা কম নিতে চাচ্ছেন। এ যুগের এই একটি লক্ষণীয় প্রবণতা।

অবধূত

অল্প দিনেই ইনি খুব জনপ্রিয় হয়েছেন। আমাদের কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এঁর লেখার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু এঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ভিন্ন আর কোনো বইতে সাহিত্যিক সম্পদ আমরা তেমন কিছু পাই নি। অদ্ভুত বর্ণনা, উদ্ভট আখ্যায়িকা, এসব অবশ্য পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে। হতে পারে এই সবই তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে। এঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' একটি দুর্গম তীর্থপথের কাহিনী। পথের দুর্গমতা চমৎকার ফুটে উঠেছে এতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুস্তর পথের যাত্রীদের, বিশেষ করে' উট-চালকদের চেহারা। এতেও কিছু কিছু অদ্ভুত বর্ণনা আছে। তবে এতে গুণের ভাগ অনেক বেশি।

দোষে-গুণে-মেশা জীবন্ত চরিত্র দাঁড় করাতে অবধূতের খুব আগ্রহ। বলা বাহুল্য এমন চেষ্টা প্রশংসার্হ। কিন্তু তাঁর সার্থকতার পথে বাধা হয়েছে অদ্ভুত ও উদ্ভটের প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ।

এক ধরনের লীলাবাদে তাঁর প্রবল বিশ্বাসও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেটি তাঁর চিন্তা ও উক্তিকে প্রহেলিকামুখী করেছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অল্প বয়সেই ইনি লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু এঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' আমাদের একালের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হয়েছে। এতেও আঁকা হয়েছে একটি আঞ্চলিক চিত্র—পূর্ববঙ্গের ভৈরববাজারের অদূরবর্তী তিতাস নদীর পারের জেলে-কৈবর্তদের ও সেই অঞ্চলের মুসলমান চাষীদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি। বহু চরিত্র এতে আঁকা হয়েছে কিন্তু ভাল ফুটেছে খুব কম চরিত্রই। কৈবর্তদের জীবনের দুঃখ-ধান্ধা, বিশেষ করে' তিতাস মরা নদীতে

পরিণত হওয়ার ফলে তাদের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল সেইটি, লেখক যত্নের সঙ্গে এঁকেছেন, আর সমস্ত প্রাণ দিয়ে এঁকেছেন সেই অঞ্চলের প্রকৃতিব ছবি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কৈবর্ত-সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে মুখ্যত একজন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি সেই পরিচয়টি এতে বিশেষভাবে ফুটেছে।

সমরেশ বসু

বাস্তবপন্থী লেখক হিসাবে ইনি অল্প দিনেই খ্যাতিমান হয়েছেন। এঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গে' লরেন্সীয় ভঙ্গির যৌন আকর্ষণ উদ্দাম রূপ পায়। এঁর পরেপরের উপন্যাসগুলোয় শ্রমিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের রূপাঙ্কনের চেষ্টা আছে। যেমন তাঁর 'গঙ্গা'য় ভাগীরথীর জেলেদের বাস্তব জীবনের চিত্র আঁকতে তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দাম রোমান্টিক প্রকৃতির ফলে সে ছবি আঁকার ক্ষমতা আজও তাঁর লাভ হয়নি। তাঁর 'গঙ্গা'র নায়ক তেঁতুলে বাগ্দীর ছেলে বিলাস লক্ষণীয় ভাবে জান্তব বীর্যবত্তার অধিকারী। কিন্তু তার মেছো জীবনের সত্যকার রূপায়ণের চাইতে লেখক বেশি মন দিয়েছেন হিমি ও তার ভিতরকার রোমান্স জমিয়ে তুলতে।

কিছু বেশি রোমান্টিক-প্রবণতা আমাদের একালের অনেক বাস্তবপন্থী লেখকের পথে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রফুল্ল রায়

ইনি একজন নবীন লেখক, কিন্তু চেষ্টা করেছেন আসাম সীমান্তের নাগাদের জীবন সম্বন্ধে একটি বড় উপন্যাস দাঁড় করাতে—সেই বইটির নাম দিয়েছেন 'পূর্বপার্বতী'। তরুণ-লেখক-সুলভ রোমান্টিক-প্রবণতা সহজেই এঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নাগাদের জীবনের নানা দিকের নানা ধরনের ছবি এতে যা

দাঁড় করাতে পেরেছেন তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আঞ্চলিক চিত্র অংকনের দিকে আমাদের একালের কিছু কিছু শক্তিশালী লেখক প্রবণতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রফুল্ল রায় তাঁদের অন্যতম।

অবশ্য এসব লেখায় বিপদও আছে। সহজেই এসব বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই সাফল্যের ফলে আর্টের যে বড় লক্ষ্য রূপ-সৃষ্টি সে সম্বন্ধে এই ধরনের লেখকরা অমনোযোগী হন। বলা বাহুল্য রূপ-সৃষ্টি ফোটোগ্রাফী নয়।

গোলাম কুদ্দুস

ইনি একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট রূপে পরিচিত। এঁর 'মরিয়ম' উপন্যাসখানিতে কমিউনিস্ট চিন্তা ও প্রচারধারা পুরোপুরিই দেখা যায়; কিন্তু সমস্ত প্রচারণা ডিঙিয়ে এতে দুঃস্থ মানবতার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে—এতেই এর বিশেষ মূল্য।

গ্রামাঞ্চলের মুসলমান সমাজের একটি মেয়ে এর নায়িকা; তাই কমিউনিস্ট জনসমাবেশে তার বক্তৃতা স্বভাবত কিছুটা অদ্ভুত লাগে। কিন্তু তার গভীর আন্তরিকতার গুণে তার চরিত্র শেষ পর্যন্ত অবাস্তব হয়নি।

অবিনাশ সাহা

ইনিও একজন নবীন লিখিয়ে—কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিশিষ্ট হয়েছ মাত্র একখানি, সেখানির নাম 'প্রাণগঙ্গা'।

এই উপন্যাসখানিতে ঢাকা জেলার সাভার অঞ্চলের চাষী ও মহাজনদের জীবন ইনি চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। এই অঞ্চলের সাধারণ জীবনযাত্রা, দৈব-দুর্বিপাকের ফলে তাদের দুর্ভোগ, ফসল ভাল হলে তাদের সচ্ছলতা, তাদের বিশেষ ভাষা, সবই আঁকা হয়েছে দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু এই বইখানিকে বিশেষ মর্যাদা

দিয়েছে লেখকের অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা। হয়ত ইনি নিজে মহাজন শ্রেণীরই লোক ; কিন্তু সেই মহাজন শ্রেণীর লোকদের দুরন্ত লোভের ফলে চাষীদের জীবনে সময় সময় অনর্থ কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করে আশ্চর্য অকপটতার সঙ্গে সেই চিত্র ইনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পল্লীর জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সহজেই বুঝবেন লেখক অতিরঞ্জন করেননি আদৌ আর লুকোনোনি কিছুই। বইটিতে একটি মেলার বর্ণনা আছে। তাতেও লেখকের সত্যনিষ্ঠা লক্ষণীয় হয়েছে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন তিনি অশ্লীল এমন কি বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করেছেন। কিন্তু আসলে তাঁর লক্ষ্য পল্লীর জীবনের বিভিন্ন দিকের একটি অকৃত্রিম পরিচয় দেওয়া।

লেখকের কিছু দুর্বলতাও বইটিতে প্রকাশ পেয়েছে—কিছু কিছু রোমান্টিক ছবি আঁকার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু এই দোষের তুলনায় এর গুণের ভাগ অনেক বড়। রূঢ় বাস্তবতা আমাদের সাহিত্যে এসেছে সাধারণত ধ্বংসধর্মী রূপ নিয়ে। কিন্তু এর যে সৃষ্টিধর্মী রূপও আছে সে-চেতনা একটি বড় লাভের ব্যাপার।

আবদুল জব্বার

একজন নবীন—অথবা তরুণ—গল্প লিখিয়ে ইনি, কোনো উপন্যাস এখনো প্রকাশ করেননি, কিন্তু এঁর গল্পগুলো—এঁর গল্পের যে ছোট সংগ্রহটি বেরিয়েছে তার নাম 'বুভুক্ষা'—এরই মধ্যে সমঝ-দারদের দৃষ্টি কিছু আকর্ষণ করেছে তাদের অভাবালু বাস্তববোধের জন্যে আর বিশেষ করে' সেই বাস্তবের রূপায়ণের ক্ষমতার গুণে। বজবজের মিল অঞ্চলের গতর খাটিয়েদের সন্তান ইনি, চারপাশের লোকদের প্রতিদিনের জীবন সম্বন্ধে এরই মধ্যে যে অভিজ্ঞতা এঁর হয়েছে তা অনন্যসাধারণ।

তবে বাস্তবের কুশলী শিল্পী হলেও দুঃস্থ মানবতার জন্য তীক্ষ্ণ বেদনাবোধই এ পর্যন্ত এঁর শ্রেষ্ঠ মানস-সম্পদ হয়ে আছে। এঁর ভবিষ্যৎ হয়ত নির্ভর করছে চিত্তকে আরো সচেতন করবার কতখানি সামর্থ্য এঁর হবে তার উপরে।

পূর্বপাকিস্তানের কথাসাহিত্য

সাম্প্রতিক কালে পূর্বপাকিস্তানে বা পূর্ববঙ্গে যে একটি নতুন সাহিত্যিক চেতনা জেগেছে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার বিস্তারিত পরিচয় দেবার সুযোগ আমাদের নেই। প্রয়োজনও হয়ত নেই, কেননা ব্যাপারটি কিছু নতুন, আরো কিছু কাল না গেলে এর চেহারা তেমন ভাল বোঝা যাবে না। ইসলামের প্রাচীন গৌরব আর একালের চিন্তা-ভাবনা এই দুই জগতের কথাই লেখকদের মনে খেলছে।

ওখানকার নতুন কথাসাহিত্য সম্বন্ধেই আমরা দুয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা করবো।

দেশ-বিভাগের পূর্বে ও-অঞ্চলে ঔপন্যাসিক রূপে খ্যাতিমান হয়েছিলেন দুইজন—'চৌচির' প্রভৃতির লেখক আবুল ফজল আর 'মোমেনের জবানবন্দী'র লেখক মাহবুব-উল-আলম। ও-অঞ্চলের আবদুর রউফের 'পথের ডাকে'ও একটি বিশিষ্ট উপন্যাস হয়েছিল, কিন্তু সেটি দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল বহু পূর্বেই।

বিভাগোত্তর কালে গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে সব নতুন লিখিয়ে নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহেদ আলী, আলাউদ্দীন আল-আজাদ আর আবু ইস্‌হাক।

এঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল-আজাদকে রূঢ় বাস্তববাদী বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর শক্তি এখনো অবিকশিত।

আমরা যতটা জানতে পেরেছি তাতে আবু ইস্‌হাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' আর প্রবীণ লেখক আবুল ফজলের নতুন প্রকাশিত

'রাঙ্গা প্রভাত' এই দুইটিই পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক কালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হয়েছে। দুটিকেই বাস্তবধর্মী বলা যেতে পারে। এই দুটিতেই খুব লক্ষ্যণীয় হয়েছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য বিশেষ ভাবে, আর দুঃস্থ মানবতার জন্য ব্যাপক-ভাবে, লেখকদ্বয়ের গভীর বেদনাবোধ।

শরৎচন্দ্রে আমরা দেখেছি অসাধারণ অঙ্কন-ক্ষমতা আর অসাধারণ দরদ। তার সঙ্গে সবল বিচার-বোধও মাঝে মাঝে দেখেছি। বিচারের দুর্বলতাও যে না দেখেছি তা নয়।

শরৎ-উত্তর সাহিত্যে আমরা কি দেখলাম?

দেখলাম এ-যুগেও অঙ্কন ক্ষমতার মান মোটের উপর প্রশংসনীয়; তবে এ যুগে দরদের জায়গা দখল করেছে—অথবা করতে চাচ্ছে—কৌতূহল, আর কৌতূহলের রাজত্ব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিচারবোধ শিথিল হয়েছে প্রায় সর্বত্র। এর ব্যতিক্রমও কিছু কিছু চোখে পড়েছে, তবে এ যুগের সাধারণ চেহারা এই। দরদে এযুগে সহজেই লেগেছে রাজনৈতিক ঝাঁজ—এও দেখা যাচ্ছে।

সোজা কথায় বলা যায়—এ-যুগে আমাদের সাহিত্যিক মান মোটের উপরে নেমে গেছে এই আমাদের ধারণা হয়েছে।

কেন এমন হল? সে সম্বন্ধে অবশ্য অনেক ভাবা যায়। কৌতূহলী পাঠকরা এ সম্পর্কে আমার 'বাংলার জাগরণ' পড়ে দেখতে পারেন। আবার এও বলা যায়—ওটা পড়া জগতের নিয়ম।

কেউ কেউ বলতে পারেন, নতুন নতুন দিগন্ত এযুগে আমাদের সাহিত্যিকদের সামনে খুলে গেছে—তার দাম তো কম নয়।

কম নয় নিশ্চয়ই; তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সাহিত্যে

বাঙালীরা পুরাতনের রোমন্থনই করছে না—কৌতূহল নতুন নতুন পথে তাদের হাতছানি দিচ্ছে।

কিন্তু বিচার করে' দেখবার আছে সেই কৌতূহলেরও মর্যাদা—অকৃত্রিম সৃষ্টিধর্মী কৌতূহল বলতে যা বোঝায় সেটি কি তাই?

আমরা যতটা দেখেছি তাতে সৃষ্টিধর্মী কৌতূহলের পরিচয় আমরা এ যুগে যে পাইনি তা নয়; কিন্তু অনেক বেশি পেয়েছি যে-কৌতূহলের পরিচয় তাকে সৃষ্টিধর্মী বলা যায় না। তা থেকে ভাল সাহিত্যিক ফলও আমরা পাইনি। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও যা গূঢ়ভাবে সত্যাভিসারী নয় সফলতা তাকে এড়িয়ে যায়।

হয়ত বলা হবে—অনেক বেশি লোক আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাজির; তাতে সাহিত্যের সাধারণ মান নেমে যাওয়া স্বাভাবিক; সব দেশেই সমসাময়িক সাহিত্যের বড় অংশ সাংবাদিকতা।

কিন্তু উন্নত সাহিত্য যেসব জাতির তারা এমন দশায়ও সাহিত্য আর সাংবাদিকতা এই দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। আমরা আছি কি?

বাস্তবিক একালে আমাদের সাহিত্যে এইটিই সমস্যা—কোন্‌টি গিল্টি আর কোন্‌টি আসল সোনা সে-সম্বন্ধে তেমন সচেতন আমরা নই।

প্রতিভা ফরমাশে গড়া যায় না; তার জন্য চিরদিনই অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সাহিত্যিক রুচি অনেকটা চর্চা-সাপেক্ষ। উন্নত সাহিত্য উন্নত জাতির জন্য চাইই; উন্নত সাহিত্যিক রুচিও তেমনি। সাহিত্যিক বিপর্যয়ের দিনে সেই রুচি জাতির জন্য হতে পারে এক বড় অবলম্বন।
